বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়
১৯৪৭-৭১

GIFT

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রিঃ

Dhaka University Library
447509

447509

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক সাহানা খাতুন

এম. ফিল. রেজিঃ ৮১/৯৮-৯৯

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লিখিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা শিরোনাম ঃ

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ১৯৪৭-৭১

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.এইচ. আহমেদ কামাল

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

447509

এম.ফিল.গবেষক ঃ

সাহানা খাতুন

রেজিষ্ট্রেশন # ৮১/৯৮-৯৯

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে সাহানা খাতুন "বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ১৯৪৭-৭১" শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করেছে। গবেষক এ অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা পুরো অংশটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকারের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপন করেনি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করার অনুমোদন দিচ্ছি।

12.12.02

447599

এ.এইচ.আহমেদ কামাল
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ১৯৪৭-৭১" শিরোনামের এই গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

২২.১২.২০০৮

সাহানা খাতুন
এম.ফিল.গবেষক
রেজিস্ট্রেশন # ৮১/৯৮-৯৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ১৯৪৭-৭১" শীর্ষক বিষয়ে আমি ২০০০ সালে এম.ফিল প্রথম পর্বের কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। ২০০৬ সালের শেষের দিকে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এই দীর্ঘ সময়ে গবেষণা কাজে আমি অনেকের কাছে ঋণী।

অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহার, চট্টগ্রাম গণগ্রন্থাগার, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)। এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের কাজে আরো সহযোগিতা করেছেন ঢাকার দেবপ্রিয় বড়ুয়া (প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এডিটর, বাসস), সুব্রত বড়ুয়া (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক বাংলা একাডেমী), কথাসাহিত্যিক বিপ্রদাস বড়ুয়া, শুদ্ধানন্দ মহাথের, সুকোমল বড়ুয়া (বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব), সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু সলিল বিহারী বড়ুয়া (বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ- এর চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্পাদক), প্রবন্ধ লেখক শিমুল বড়ুয়া, সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া, প্রফেসর জিনবোধি ভিক্ষু (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), সুগত চাকমা (পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙামাটি), সাথুয়াই মারমা (বান্দরবান) প্রমুখ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার এই গবেষণা কাজের সাফল্যজনক অগ্রগতির জন্য আমাকে এক বৎসরের (০৮-১২-২০০৩ তারিখ থেকে ০৭-১২-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত) এম, ফিল ফেলোশীপ প্রদান করায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই।

সবচেয়ে বড় কথা, আমার এই কাজ সম্পন্ন করতে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি আমার শিক্ষক ও গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এ, এইচ, আহমেদ কামাল। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন। গবেষণা বিষয়ে তার সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রকে সহজতর করেছে। অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত একাধিকবার পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শও তিনি আমাকে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আরো যাঁরা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা হলেন একই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রতনলাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক শরিফুল্লাহ ভূঁইয়া, ড. ইফতেখার-উল-আউয়াল, সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ্ কামাল, ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর প্রমুখ এবং সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ও সহকারী অধ্যাপক বিমান বড়ুয়া।

এছাড়া সকল বিষয়ে সব সময় সহযোগিতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্টাফ জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, জনাব নুরুল ইসলাম, জনাব হোসেন আহমেদ ও শ্রী রতন কুমার দে-র প্রতি রইল আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমার স্বামী আসাদুল্লাহ-র নিরন্তর প্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পরিশেষে আমি আমার বাবা ও মায়ের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি যাঁদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

সাহানা খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম-লগ্ন থেকে শুরু করে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ভারত উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে ছিল। বাংলাদেশে এ ধর্মের প্রভাব ছিল আরো গভীর ও ব্যাপক। এদেশে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে শুরু করে শিল্প সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি প্রভাবিত হয়েছিল এ ধর্মের দ্বারা। সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে সম্রাট কনিস্ক, রাজা হর্ষবর্ধন, সপ্তম শতকের খড়্গ ও চন্দ্র বংশের রাজগণ, নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের দেব রাজগণ এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের বর্মন রাজাদের পৃষ্টপোষকতার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম এর স্বর্ণযুগে পৌছেছিল। বৌদ্ধ সভ্যতায় শিক্ষার এক একটি কেন্দ্র রূপে সেসময় গড়ে উঠেছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ত্রিকূটক ও বাসুবিহার, রাজশাহীর পাহাড়পুরের জগদ্দল ও সোমপুরী বিহার, কুমিল্লার কনকস্তূপ ও শালবন বিহার, ঢাকার বিক্রমপুরী ও ধর্মরাজিক বিহার, চট্টগ্রামের হাইদগাঁও-এ চক্রশালা বিহার ও পন্ডিত বিহার প্রভৃতি। বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রেও বাঙালী বৌদ্ধগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন শান্ত-রক্ষিত, শীলভদ্র, চন্দ্রগোমীন, জেতারী, বনরত্ন, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অভয়াকর গুপ্ত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের রচয়িতা বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যগণ, যেমন- লুইপা, কাহ্নপা, হরপা প্রমুখ। বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রফলক এবং চৈনিক পর্যটকবৃন্দের ভ্রমণ বিবরণী থেকেও এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল পরিব্যাপ্তির প্রমান পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে ফাহিয়েন, সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হিউয়েন সাং, সপ্তম শতকের শেষ দিকে তাও-লিন, সেং-চি এবং ইত-সিং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী শত শত বিশাল বৌদ্ধ বিহার এবং ভিক্ষু দেখতে পেয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ক্রমশঃ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে এ ধর্ম তার স্বকীয়তা হারিয়ে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকলেও এখনো অত্যন্ত সংকুচিত ভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকগণ কর্তৃক বিভিন্ন এলাকা শাসিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সময়ে পালাক্রমে সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। কালের গতিতে বৌদ্ধ ধর্মও একসময়ে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও বর্তমানে অতি অল্প সংখ্যক বৌদ্ধদের বসবাস স্বল্প

Dhaka University Institutional Repository

জায়গাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই অল্প সংখ্যক বৌদ্ধদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্য। যা তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকে থেকে বাঙালী বা সমতলীয় এবং পাহাড়ী বৌদ্ধ-এ দু'ভাগে বিভক্ত। এদের বেশিরভাগই বাস করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং খুব স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধই বাংলাদেশের অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এদেশে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ফলে বৌদ্ধরাও বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ সম্বলিত মতবাদ থেরবাদ থেকে বিবর্তিত হয়ে মহাযানী মতবাদ গ্রহন করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রারম্ভে মহাযানী মতবাদ থেকে থেরবাদী মতবাদে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযান অধ্যুষিত বাংলাদেশে থেরবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকে বৌদ্ধ সমাজের নবজাগরণ সূচিত হয় এবং দ্রুত গতিতে বৌদ্ধ সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এজন্য তারা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এক্ষেত্রে তাদের প্রথম সংগঠন 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য একের পর এক সংগঠন গড়ে তোলে এবং এগুলোর মধ্যে ১৯৪৯ সালে বাঙালী বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' সংগঠনটি সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে। পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যেও পৃথকভাবে এসময় থেকে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

এ সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পাকিস্তানের রাজনীতিতেও ভূমিকা রাখে এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সমর্থন হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রাজনীতিবিদ হলেন সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান, রাজা ত্রিদিব রায়, মানবেন্দ্র নারয়ন লারমা, অং শৈ প্রু প্রমুখ। বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ নিজেদের এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হন। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ সংগঠনের মাধ্যমে বৌদ্ধদের বিভিন্ন অধিকার ও দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট তুলে ধরা হয় এবং সরকারও বিভিন্ন সময়ে এসব দাবী মেনে নেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও সংগ্রামী ভূমিকা থেকে পিছিয়ে থাকেনি। মুষ্টিমেয় কিছু আরাকানী বা পাহাড়ী বৌদ্ধ ব্যতীত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে বাস্তবায়নের জন্য তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়ন পত্র	I
ঘোষণা পত্র	II
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	III-IV
সূচিপত্র	V-VI
ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায়	৬-৫৫
পটভূমি ঃ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৫৬-৭০
১৯৪৭ সাল-পরবর্তী পাকিস্তানে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঃ	
তৃতীয় অধ্যায়	৭১-৯৬
১৯৭১ সাল-পূর্ব বৌদ্ধ সংগঠনসমূহ ঃ	
চতুর্থ অধ্যায়	৯৭-১৩১
মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঃ	
উপসংহার	১৩২-১৩৪
পরিশিষ্ট-১ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রস্তাব সমূহ ঃ	১৩৫-১৩৯
পরিশিষ্ট-২ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংগঠন 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি'র সরকারের নিকট পেশকৃত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি ঃ	১৪০-১৪৩
পরিশিষ্ট-৩ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রস্তাব ঃ	১৪৪-১৪৬
পরিশিষ্ট-৪ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রস্তাবঃ	১৪৭
পরিশিষ্ট-৫ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত ফনিভূষণ বড়ুয়ার প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠিঃ	১৪৮-১৪৯
পরিশিষ্ট-৬ ঃ সুধাংশ বিমল বড়ুয়ার চিঠি ঃ	১৫০
পরিশিষ্ট-৭ ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে সরকারী ছুটি ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব সম্বলিত চিঠির অংশ ঃ	১৫১
পরিশিষ্ট-৮ ঃ সংঘ কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্রের অনুলিপি ঃ	১৫২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯ ঃ জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের থাইল্যান্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে লেখা পত্র ঃ ১৫৩

পরিশিষ্ট-১০ ঃ মুক্তিযুদ্ধকালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা ঃ ১৫৪

পরিশিষ্ট-১১ ঃ ১৯৭১ সালে আরও নিখোঁজ ও নিহত ব্যক্তিদের তালিকা ১৫৫

পরিশিষ্ট-১২ ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা ঃ ১৬৫-১৫৮

পরিশিষ্ট-১৩ ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের নাম ঃ ১৫৮-১৫৯

পরিশিষ্ট-১৪ ঃ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নামঃ ১৬০-১৬৫

পরিশিষ্ট-১৫ ঃ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অবদানঃ ১৬৬-১৬৭

পরিশিষ্ট-১৬ ঃ যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান করে যারা মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অবদান রেখেছেনঃ ১৬৮

পরিশিষ্ট-১৭ ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানকারী গ্রামের নামঃ ১৬৯

মানচিত্র সংখ্যা-২

সারণী সংখ্যা- ১১

গ্রন্থপঞ্জী ১৭০-১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পরই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের স্থান। একথা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হলেও এখানে বৌদ্ধ জনসংখ্যা খুবই কম। তবুও ইতিহাসের গতিধারায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সময়ের বৌদ্ধদের নিয়ে সুবিন্যস্তভাবে কোথাও কোন কাজ সম্পাদিত হয়নি। তবে বৌদ্ধদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে এবং বাঙালী ও আরাকানী বৌদ্ধদের সম্পর্কে পৃথকভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হলেও সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ হয়েছে খুবই কম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নূতন চন্দ্র রচিত 'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস', সুকোমল চৌধুরীর 'বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি', নলিনীনাথ দাস গুপ্তের 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম', জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়ার 'আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রভৃতি। বৌদ্ধ সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং দেশের সকল কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভবে জড়িত। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুপস্থিতির পর ধীরে ধীরে বৌদ্ধরা নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে শুরু করে । ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারা এদেশের রাজনীতিতে নিজেদের স্থান তৈরি করে নিতে থাকে বিভিন্ন ভাবে।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সম্রাট অশোক এ ধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করে একে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন দেশে তিনি এর প্রচার ও প্রসারের জন্য ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেছেন এবং ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ বিভিন্ন শিলালিপি,প্রস্তরখন্ড ও পর্বতগাত্রে লিপিবদ্ধ করে স্বীয় সাম্রাজ্যের জনগণের অনুশীলনের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অশোকের পরবর্তী বৌদ্ধ শাসকগণের সময়েও বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করে এবং এসময় থেকে বৌদ্ধ ধর্মে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। পাল বংশের শাসনকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ ইত্যাদি নির্মিত হয় এবং রাজারাও তাঁদের নামাঙ্কিত মুদ্রা, শিলালিপি, ফলক-সমূহ উন্মোচন করেন। বহু বিদেশী পর্যটকও এসময়ে এদেশে আগমন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ভিন্ন ধর্মীয় রাজা যেমন সেন ও বর্মন রাজাদের সময়ে ধর্মীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিকূল পরিবেশের চাপে এর স্বকীয়তা হারাতে থাকে। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যের ফলে এ ধর্মের বহু রীতি-নীতি বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতির সাথে মিশে যায়। এছাড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় রাজাদের রাজত্বকালে ধর্মীয় বিরোধীতা এবং অত্যাচার-নির্যাতনে বৌদ্ধদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়। এরপরে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের আগমনের ফলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় বহু বৌদ্ধ বিহার এবং বৌদ্ধরা ক্রমশ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন বৌদ্ধশাসিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামেও ব্যাপকভাবে এসময়ে বৌদ্ধদের আগমন ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বা আরাকানী বৌদ্ধদের আগমন ঘটে পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মা ও আরাকান থেকে। এদের বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি সবকিছুই সমতলীয় বড়ুয়া বৌদ্ধদের থেকে আলাদা। সমতলীয় বৌদ্ধরা তাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধরা হীনযান বৌদ্ধধর্মমতের অনুসারী হলেও তাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল।

বাংলাদেশে হীনযান বা থেরবাদী মতবাদের পুনর্জাগরণ ঘটে উণবিংশ শতকের শেষের দিকে। এর পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ছিল হিন্দুধর্মের মিশ্রণে একটি সংমিশ্রিত ধর্ম। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা, আরাকান ও বার্মা একই শাসনাধীনে চলে আসার ফলে আরাকান ও বার্মার থেরবাদী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও প্রভাবান্বিত হয় এবং থেরবাদী মতবাদ গ্রহণ করে।

বৌদ্ধরা এদেশের আন্দোলন ও সংগ্রামগুলোতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল আন্দোলনে বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করে স্বতস্ফূর্তভাবে। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বৌদ্ধরা নিজেদের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলনসহ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করেছে সক্রিয়ভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও বৌদ্ধদের অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। বিভিন্ন ভাবে পাক সৈন্যদের প্রতিরোধ করা ছাড়াও বৌদ্ধরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সাহায্য দিয়ে ও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রদান করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনেকে বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত বিশেষ করে বৌদ্ধ জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। ফলে বৌদ্ধদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। এ বিষয়গুলিকে বর্তমান অভিসন্দর্ভে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালে বাংলাদেশে বসতি ও বিস্তার, বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি, বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান, তাদের সংখ্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ভারত বিভাগের সময়ে বৌদ্ধদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম '১৯৪৭ সাল পরবর্তী পাকিস্তানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়'। এ অধ্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বৌদ্ধদের অবস্থা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় পাকিস্তান গণপরিষদে মৌলিক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসননীতি, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বৌদ্ধ সদস্য এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আরাকানী বৌদ্ধদের সংগঠন সমূহ, সমতলীয় বৌদ্ধদের সংগঠন সমূহ, সরকারী নথিপত্রে উল্লেখিত সংগঠন সমূহ এবং 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' সংগঠনটির গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়'। এই

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধকালীণ সময়ে বৌদ্ধ শরণার্থী, স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ভূমিকা প্রভৃতি।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থান বিশেষ করে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিয়ে উপরোক্ত সময়সীমায় কোন কাজ হয়নি। ১৯৪৭ সালকে সূচনা হিসেবে গ্রহণ করার প্রধান যুক্তি এই যে, উপরোক্ত সময়ের পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজনৈতিকভাবে এ সকল সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভিন্নতর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়। এসময়ের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আমদের জ্ঞান অতীব সীমিত। তবে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবী প্রমাণ করে যে, তারাও নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র চেতনার পরিচয় দিতে আগ্রহী হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয় যা ছিল একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় যেখানে ধর্মভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ট ও সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন প্রশ্নই ছিল না।

এই অভিসন্দর্ভটির মৌলিক আকর ও উপাত্ত ছিল বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত উপরোক্ত সময়কালের অপ্রকাশিত দলিলপত্র। একই সাথে 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ'- এর প্রকাশিত প্রবন্ধ, এই সংগঠনের কাগজপত্র, বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের নথিপত্র, প্রকাশিত পুস্তিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদি উপকরণও অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

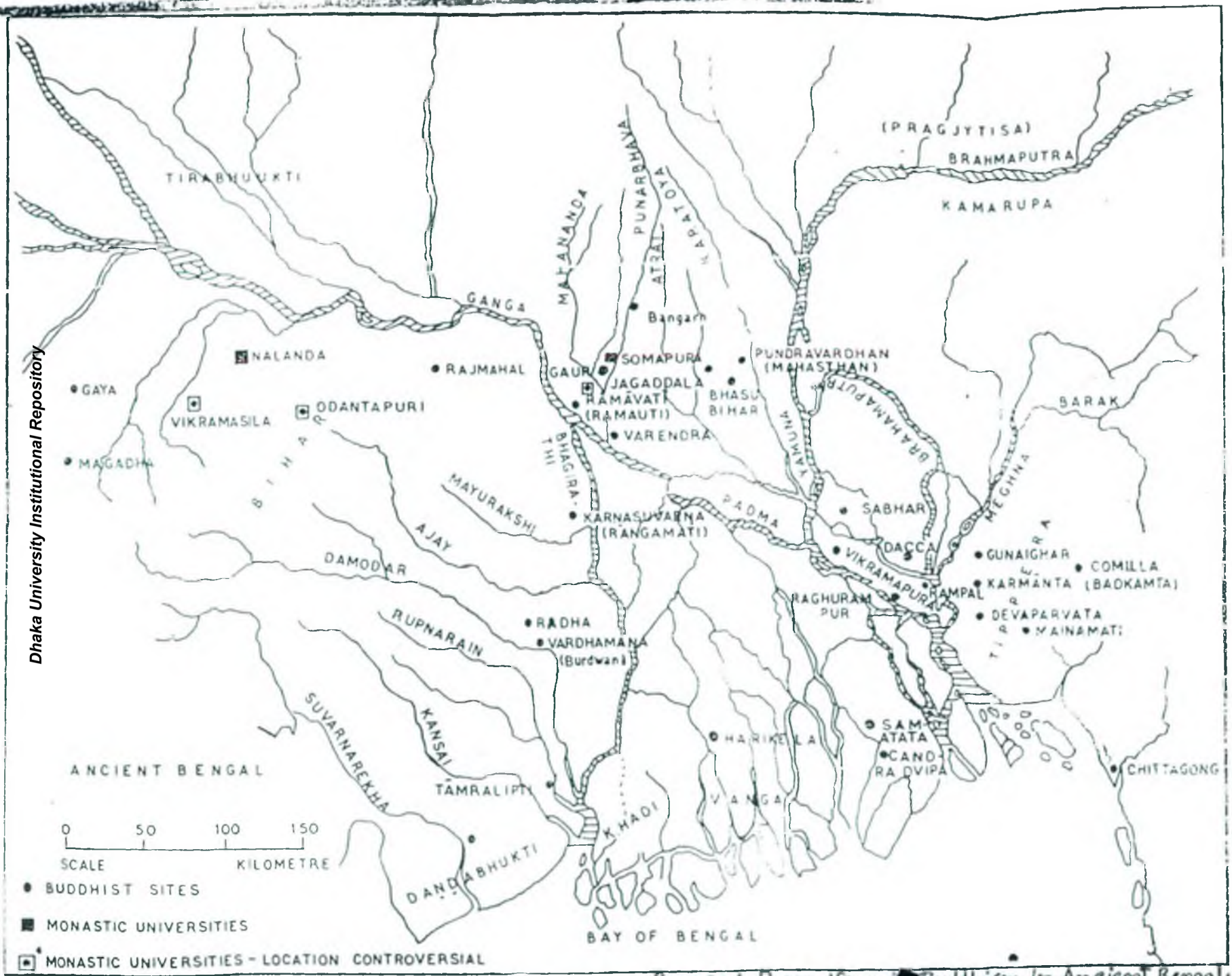

Source: Puspa Niyogi, Buddhism In Ancient Bengal, Page-VII, Calcutta, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয় গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে যা অন্য দেশের ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল। ক্রমান্বয়ে এ ধর্ম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছাড়াও শ্রীলংকা, বাংলাদেশে, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্থানে প্রচার ও প্রসার পায়।

সময়ের বিবর্তনে সকল জায়গাতেই বৌদ্ধ ধর্মেরও বহু বিবর্তন ঘটে এবং অদ্যাবধি এ বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, ভারতের সমাজ ও দর্শনের ক্ষেত্রেও গৌতম বুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। এজন্য ঐতিহাসিক Basham উক্তি করেছেন "বুদ্ধ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান।"[১] বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আবিস্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শনসমূহ অতীতকালে এদেশে বৌদ্ধধর্মের গৌরবের কথাই ঘোষণা করে। ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পন্ডিত ব্যক্তি ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হলে প্রাচীনকালের বৌদ্ধধর্ম ও এর তৎকালীন সমৃদ্ধির বিষয়টি সকলের সম্মুখে উম্মোচিত হয়। এর পাশাপাশি বিশাল এক এলাকা জুড়ে আবিস্কৃত হতে থাকে এক এক করে বৌদ্ধসভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন সমূহ। পাশ্চাত্যের বহু পন্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় সাহিত্য চর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেকস্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও সচেতন হয় তাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির বিষয়টি অবগত হয় এবং গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম ও শিক্ষার প্রতিও তারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। এছাড়া এদেশে এককালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপক বসবাস ছিল এবং তারাও সেই একই ঐতিহ্যের অধিকারী এ সম্পর্কেও বৌদ্ধরা নিশ্চিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয় এবং একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এসময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় অধিক পরিমানে সংগঠিত এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। এসময়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় যখন দেশ ত্যাগ করছিল তখন সেই অস্থিরতার সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদেরকে এদেশের ভূমিজ সন্তান বলে ঘোষনা করে এবং এদেশ ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। নবসৃষ্ট পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার অবসান জানালেও বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করে এবং পরে যুক্তপ্রথা নির্বাচনে তাদের জন্য আসন বরাদ্দ রাখার দাবী জানায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হয় যার অধিকাংশই সরকার বিভিন্ন সময়ে মেনে নেয়। যেমন, বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা, বিভিন্ন কারিগরী, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা প্রদানসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধদেরকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতিদান, বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে সাধারণ ছুটি ঘোষণা, ঢাকার কমলাপুরে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য সরকারের জমি প্রদান, বৌদ্ধদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও পালি বোর্ড গঠন ইত্যাদি ব্যবস্থা এদেশে বৌদ্ধদের অবস্থানগত দাবীকেই সুদৃঢ় করে। শুধু তাই নয়, এসময় বৌদ্ধরা জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচিত হয়ে দেশের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতাকেও প্রমাণ করে।

বাংলাদেশে প্রাচীন কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসতি ও বিস্তার

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ও বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে ভারতের বিস্তীর্ন অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও প্রসারের কথা জানা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশ ও এর বাইরে বৌদ্ধ ধর্ম বিকাশে বাঙালী বৌদ্ধগণ ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছে কিনা এবং গৌতম বুদ্ধ নিজেও বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুক্তনিকায়, দিব্যাবদান, অশোকবদান এবং অবদানকল্পলতা অনুসারে ধারণা করা হয় যে, বুদ্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন এবং তাঁর সময়েই বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার লাভ করে।[৩] তবে পুন্ড্রবর্ধণ (উত্তর বঙ্গ), সমতট (চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলা) এবং কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ) কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেন। এমন কি, বুদ্ধের ঘনিষ্ট কয়েকজন শিষ্যের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বাঙালীও ছিলেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন বঙ্গান্তপুত্ত এবং বঙ্গীশ। বাঙালা বা বাংলাদেশের অধিবাসী বলেই তাদের এরূপ নামকরণ হয়েছিল।[৪]

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়কাল থেকেই যে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে তার বিভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী রাজ্য সুবর্নভূমি অর্থাৎ মায়ানমারে 'সোন' ও 'উত্তর' নামক দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন। সিংহল অভিযান গ্রন্থ ও বৌদ্ধযুগের ভূগোল গ্রন্থের মধ্যেও এ কাহিনীর প্রমাণ মেলে। মহাবংস নামক গ্রন্থেও 'সোন' ও 'উত্তরকে' যে সুবর্ন ভূমিতে প্রেরণ করা হয়েছিল এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ প্রচারকদ্বয় নিশ্চয়ই মায়ানমার যাবার পথে বাংলাদেশের স্থল বা জলভাগের উপর দিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। তাই সে সময় বাংলাদেশে তাঁদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার না হওয়ার কোন কারণ নেই।[৫]

সম্রাট অশোক যে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার অন্যান্য প্রমানও রয়েছে। মহাবংস ও অশোকাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেখানে বুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সে সব স্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এভাবে তিনি নিজের বিশাল সাম্রাজ্যে ৮৪ হাজার স্তূপ ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কোন কোন ঐতিহাসিক সে সব স্তূপ ও স্তম্ভের একাধিকটি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলাসহ ধামরাই ও শাখাসর অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল মনে করেন।[৬]

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের একটি শিলালিপি ১৯৩১ সাল মহাস্থানগড়ে পাওয়া গিয়েছে।[৭] এটা মৌর্যযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এ লিপিটিতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। গুপ্ত আমলের আবিস্কৃত লিপিমালার মাধ্যমে জানা যায় পুন্ড্রবর্ধন গুপ্ত সাম্রাজের সর্ববৃহৎ বিভাগ ছিল। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক কে. এন. দীক্ষিত- এর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত খননকার্য চালানো হলে আবিস্কৃত হয় বৈরাগীর ভিটা, খোদার পাথর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, মানকালীর ভিটা, জিয়ৎকুন্ড, পরশুরামের বাড়ী, নরসিংহের ধাপ ইত্যাদি। এখানে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী ও নগর পত্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এ নগরটি একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ রূপে গড়ে উঠেছিল। মৌর্য যুগের

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপিটি পরীক্ষা করে অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল।[৮] খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ নাগার্জুনীকোন্ডা শিলালেখর মধ্যে বাংলাদেশের নাম পাওয়া যায় যা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে মনে করা হয়।[৯] তিব্বতী গ্রন্থ থেকে জানা যায় আচার্য নাগার্জুন পুন্ড্রবর্ধনে কিছু বিহার নির্মান করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'মিলিন্দপঞহ' নামক পালিগ্রন্থে, 'ললিত বিস্তর' (২য় শতক) 'মহাবস্তু' (৩য় শতক) প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে বংগের কথা উল্লেখ আছে।[১০]

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের যে প্রসার ঘটে তা জানা যায় সে যুগের উৎকীর্ণ তাম্র, শিলানুশাসন ও মূর্তি শিল্পের মাধ্যমে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে চৈনিক পরিব্রাজকেরা বাংলাদেশে এসেছিলেন। গুপ্ত যুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতে আসেন বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য। পনের বছর ছিলেন তিনি ভারতে। বাংলাদেশের তাম্রলিপিতে তিনি বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন। ফা-হিয়েনের আগেও চৈনিক পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন এদেশে। তাঁদের বসবাসের জন্য শ্রীগুপ্ত বিহার নির্মাণ করান মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে এবং এর সংরক্ষণের জন্য ছাব্বিশটি গ্রাম দান করেন যা উত্তর বঙ্গের কোন স্থানে অবস্থিত।[১১]

গুপ্তযুগে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তি শিল্পগুলি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে রাজশাহীর বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তিটি।[১২] ব্রঞ্জ- এর নির্মিত বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তিটি আবিস্কৃত হয়েছে বগুড়া জেলার মহাস্থানের বলাই ধাপ স্তূপের নিকট। আনুমানিক ৫০৬-৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে বর্তমান কুমিল্লা জেলার গুনাইঘর গ্রামে। মহারাজ বন্যগুপ্ত শৈব ধর্মাবলম্বী হয়েও বৌদ্ধ বিহারের জন্য জমি দান করেছেন। গুনাইঘর অনুশাসন থেকে অনুমান করা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।[১৩] সম্প্রতি বেলে পাথরের একটি দন্ডায়মান বৌদ্ধমূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে কুমিল্লা শহরতলীর রূপবানমুড়ায়। এটি শেষ গুপ্ত যুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের অলংকরন বলে মনে করা হয়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্তত্তোর যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুষ্যভূতি রাজবংশের রাজা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমগ্র উত্তর প্রদেশ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে। হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শিবের উপাসক থাকলেও পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেন হিউয়েন সাং এর প্রভাবে এবং এ ধর্মের উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হন। তাঁর সময়ে দুজন কৃতি সন্তান শীলভদ্র ও চন্দ্রগোমীন বাংলাদেশে আবির্ভূত হন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালী পন্ডিত, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শীলভদ্র সমতট রাজ্যের রাজধানী কর্মান্তনগর বা বড়কামতার (বর্তমান কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার নিকটবর্তী) ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অসাধারণ পন্ডিত ও নৈয়ায়িক শীলভদ্র বৌদ্ধদর্শন ব্যতীত বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায় ও পারদর্শী ছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁর নিকট অধ্যয়ণ করতেন।[১৬] বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রের উপর তাঁর মাত্র একখানি পুস্তক পাওয়া যায় এবং তা হলো বুদ্ধভূমি সূত্র এবং বুদ্ধভূমি ব্যাখ্যান। উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান চন্দ্রগোমীন ছিলেন একজন বৈয়াকরণিক, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক, জ্যোতির্বিদ, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং বৌদ্ধতন্ত্রের উপদেষ্টা ও লেখক। চন্দ্রগোমীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো প্রাচীন বাংলার চান্দ্র ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণের টীকা বা বৃত্তি আবিস্কার। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে এক বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ লাভ করেন বৌদ্ধ যোগাচার মতবাদে তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের কারণে।[১৭]

সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আসেন হিউয়েন সাং, ইত-সিং, তাও-লিন, সেং-চি প্রমুখ পন্ডিত বর্গ। বৌদ্ধধর্ম চর্চার উদ্দেশ্যে সুদূর চীন থেকে আসলেও তাঁরা তাদের ভ্রমণ বিবরণীতে তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার প্রামান্য চিত্র তুলে ধরেছেন। হিউয়েন সাং আনুমানিক ৬৩৬ খ্রীঃ থেকে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন।[১৮]

তিনি এ সময়ে বাংলার চারটি স্থানে কর্নসুবর্ন, সমতট, পুন্ড্রবর্ধন ও তাম্রলিপ্তিতে পরিভ্রমণ করেন এবং এসব স্থানে বহু স্তূপ দেখেছিলেন।[১৯] পুন্ড্রবর্ধনের বিশটি বৌদ্ধ বিহারে মহাযান ও থেরবাদী-উভয়পন্থী তিন হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পো-সি-পো বা বাসুবিহার ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার এবং এখানে বুদ্ধদেব অবস্থান করায় সম্রাট অশোক একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজবংশ সমূহের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম

পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রায় শতবর্ষ পূর্ব থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনভাবে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধধর্ম অনুরাগী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়।[২১] এগুলো হচ্ছে সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত খড়্গবংশ, রাতবংশ, দশম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চন্দ্রবংশ, দেব বংশ এবং একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পট্টিকেরা বংশ।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নাম সমতট এবং এই সমতট অঞ্চলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী একটি উন্নত সভ্যতার সূচনা হয়। গুনাইঘর শাসন লিপি থেকে জানা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববাংলায় বিশেষত কুমিল্লা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। হিউয়েন সাং সমতট সম্পর্কে যে প্রামাণিক বিবরণ রেখে গেছেন তা থেকে জানা যায়, রাজধানী সমতটে ৩০টির মতো সংঘারাম আছে যেখানে দুইশত বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন। ঢাকা থেকে উত্তর-পূর্বে ৩০ মাইল দূরে আশ্রাফপুরে যে দুটি শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে খড়্গ বংশের পর্যায়ক্রমে পাঁচ জন নৃপতির রাজত্বের কথা জানা যায় এবং এরা খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ, রাজ রাজভট্ট এবং বলভট্ট।[২২] খড়্গ বংশের রাজাদের রাজধানী কর্মান্তবসাক ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন।[২৩] খড়্গদের প্রদত্ত আশ্রাফপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত 'জয় কর্মান্তবাসক' নটেশ্বর মূর্তির নিম্ন লেখমালার কর্মান্ত শব্দ থেকে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার নিকটবর্তী বড়কামতাকে সমতট রাজ্যের রাজধানী এবং বড়কামতা থেকে ১ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে ২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মহামায়া স্তূপকে হিউয়েন সাং এর দেখা সম্রাট অশোক নির্মিত স্তূপ বলে চিহ্নিত করা হয়।[২৪] বড়কামতার আশেপাশে ডেলসা, শুভপুর, বিহারমন্ডল, বগের পার, পিরব ইত্যাদি এলাকা থেকে অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপানি, ধ্যানীবুদ্ধ, দেবী মারিচের মূর্তি পাওয়া গেছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের চার দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত সমতট অঞ্চলের আর এক রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাজবংশ রাতবংশ নামেই পরিচিত এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন সমতটেশ্বর প্রতপোপনত সামন্ত চক্রশ্রী জীবধারণ রাত, তাঁর পুত্র ছিলেন সমতটেশ্বর শ্রী ধারন রাত, শ্রী ধারনের পুত্র ছিলেন যুবরাজ বলধারন রাত।[২৫] সমতট অঞ্চলের আর একটি তাম্রশাসন থেকে বৌদ্ধ রাজবংশ দেব বংশের (আনুঃ ৭৫০-৮০০ খ্রীঃ), কথা জানা যায় এবং এতে পাওয়া যায় দেব বংশের

Dhaka University Institutional Repository

চারজন নৃপতির নাম। এরা হলেন- শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব বঙ্গালমৃগাংক, ভবদেব অভিদেব মৃগাংক। দেব রাজাদের রাজধানী দেবপর্বত থেকে ভবদেব সম্ভবত তাঁর তাম্রশাসন প্রদান করেছিলেন। দেবপর্বতের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে কুমিল্লার দক্ষিণাংশে ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের চন্ডীমুড়া পর্বতকে বা ক্ষীরোদা (আধুনিক খীরা বা খীরনই) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অন্যান্য বৌদ্ধ রাজবংশের মত এদের সীলমোহরে ধর্মচক্র মুদ্রা থাকায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্থিরকৃত হয়েছে এই রাজবংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

সমসাময়িক কালে চন্দ্রবংশ (আনুঃ ৮৬৫-১০৫৫ খ্রীঃ) নামে আর এক বৌদ্ধ রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এ বংশের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্বর। লালমাটি থেকে রোহিতগিরি শব্দের উদ্ভব এবং এটা কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ে অবস্থিত।[২৬] রোহিতগিরির প্রতিষ্ঠাতা অধিপতির নাম ছিল পুর্ণচন্দ্র এবং তৎপুত্র সুবর্ণচন্দ্র পরবর্তীকালে রাজত্ব করেন (আনুঃ ৮৮৫-৯০৫ খ্রীঃ)। সুবর্ণচন্দ্র সিংহাসন লাভের পর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র রাজা হন এবং তাঁকে হরিকেল রাজ বলা হয়। এর পর সমগ্র বঙ্গের রাজা হন ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র দেব।[২৭] চন্দ্র বংশের সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তাঁরা স্বীয় ধর্মের পৃষ্টপোষকতা করেছেন।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে পট্টিকেরা বংশের রাজা রাজত্ব করতেন। 'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা', ১১৮৪ সনের বার্মিজ অনুশাসন ও বার্মার ইতিহাস থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। ময়নামতি পাহাড়ের কাছে পট্টিকেরা নামক একটি গ্রাম এখনো আছে। পট্টিকেরা বংশের রাজাদের সাথে বার্মিজ রাজাদের মেলামেশা ছিল বলে জানা যায়। ময়নামতি তাম্রশাসন থেকে পট্টিকেরা বংশের রাজা হরিকেল দেবের কথা জানা যায়। হরিকেল দেব আনুমানিক ১২০৪ খ্রীঃ থেকে ১২২০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। স্বীয় রাজত্বের ১৭ তম বছরে রাজা হরিকেলদেব বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমি দান করেন। কনকস্তূপ বিহার প্রসঙ্গে বলা হয়, এ বিহারটি ছিল কুমিল্লার পট্টিকেরাতেই।[২৮]

এভাবে সমতট অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে খড়্গবংশ, চন্দ্রবংশ, দেববংশ এবং পট্টিকেরা বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এদের অনেকেরই রাজধানী গড়ে উঠেছিল লালমাই, ময়নামতি ও চান্দিনায়। এসব বংশের বৌদ্ধ রাজাদের আনুকূল্যে পেয়ে এ অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম, চৈত্য,

Dhaka University Institutional Repository

স্তূপ ইত্যাদি। বর্তমান কুমিল্লা জেলার লালমাই ময়নামতির অঞ্চলে খননকাজের ফলে প্রাচীন আমলের বহু ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এসব ধ্বংশাবশেষের মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার, কুটিলামুড়া, ছাড়পত্রমুড়া, বৈরাগীমুড়া, রূপবানমুড়া, বলা গাজীর মুড়া, ইটখোলামুড়া, হাতিগাড়া মুড়া, উজিরপুরমুড়া, পাককামুড়া, খিলামুড়া, চন্ডীমুড়া, ইত্যাদি। লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হচ্ছে আনন্দ রাজার প্রাসাদ, ভোজ রাজার প্রাসাদ, রানীর প্রাসাদ ও শালবন রাজার প্রাসাদ। এসব ধ্বংশাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কুমিল্লার জেলার প্রাচীনকালের উন্নত বৌদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহণ করে। বিভিন্ন রাজবংশের সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় সমৃদ্ধ ময়নামতি সে সময়ে পৌছেছিল পৃথিবীর উন্নত শহরগুলির পর্যায়ে। এখানে প্রাপ্ত স্বর্ন ও রৌপ্য মুদ্রা প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রমাণ দেয়। পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মা বা দূরবর্তী দেশ আরবের সাথেও ময়নামতির যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল।

সুতরাং কুমিল্লার শালবন, ত্রিরত্ন, কুটিলামুড়া, রাজশাহীর পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় এবং সাম্প্রতিক খনন কার্যের ফলে আবিস্কৃত কুমিল্লার রূপবানমুড়া, যশোর-খুলনা অঞ্চলের ভারত ভায়না, বগুড়ার বাসু বিহার, দিনাজপুরের সীতাকুট বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এককালে বাংলার সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী রূপেই বিরাজমান ছিল। সঠিক ভাবে বিভিন্ন স্থানে খনন কার্যের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করলে ভবিষ্যতে আরও নিদর্শন আবিস্কৃত হতে পারে।

পাল শাসনামলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

অষ্টম শতকে বাংলায় পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ সূচিত হয়। গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম পাল বংশ। তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ যথাক্রমে দ্বিতীয় নরপতি ধর্মপাল (আনুঃ ৭৮১-৮২১ খ্রীঃ), তৃতীয় দেবপাল (আনুঃ ৮২১-৮৬১ খ্রীঃ) ষষ্ঠ নারায়ন পাল, (আনুঃ ৮৬৬-৯২০ খ্রীঃ), সপ্তম রাজ্যপাল (আনুঃ ৯২০-৯৫২ খ্রীঃ), দ্বিতীয় গোপাল (আনুঃ ৯৫২-৯৬৯ খ্রীঃ) দশম প্রথম মহীপাল (আনুঃ ৯৯৫-১০৪৩ খ্রীঃ), একাদশতম নয়পাল (আনুঃ ১০৪৩-১০৫৮ খ্রীঃ), পঞ্চদশতম রামপাল (আনুঃ ১০৮২-১১২৪ খ্রীঃ) প্রমুখ[২৯] পর্যায়ক্রমিক বিশজন পরাক্রান্ত নরপতির সকলেই ছিলেন মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ। ধর্মপাল ও

Dhaka University Institutional Repository

দেবপাল সমতট ব্যতীত সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে স্বাধীন বাংলা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৩০] প্রায় চার শতাধিক বৎসর কাল বাংলায় পাল শাসন কালে বৌদ্ধ ধর্ম লাভ করে রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা। পাল রাজগণ সকলে মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁরা অফিসের কাগজপত্র, শিলালেখ সমূহে বুদ্ধের নাম স্মরণ করার প্রথা চালু করেন। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নতুন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ও পুরাতন বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করেন। পাল যুগেই বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশ পায় এবং বাংলা ভাষায় আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা লিখিত হয়। সুদীর্ঘ এই রাজত্বকালে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৌছে গিয়েছিল উন্নতির স্বর্ণশিখরে। আর এ কারণেই শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালী জাতি অন্যান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পাল বংশের শাসকগণ এবং তাদের অনুসারীরা তান্ত্রিক মহাযান মতাবলম্বী হলেও তারা অন্যান্য ধর্মের পৃষ্টপোষক ছিলেন। দীর্ঘ চারশ বৎসর রাজত্বকালে তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যে বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন যার অনেকগুলোই বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এবং ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। যেমন- বিক্রমশীলা বিহার, ওদন্তপুরী মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, বিক্রমপুরী মহাবিহার, দেবীকোট মহাবিহার, ত্রৈকূট মহাবিহার, সীতাকূট বিহার এবং পন্ডিত মহাবিহার। এসব বিহারে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বহু বিষয় অধ্যয়ণের সুযোগ ছিল এবং এগুলি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।[৩১]

পাল শাসনামলেই বৌদ্ধধর্ম মহাযান থেকে তন্ত্রযানে বিবর্তিত হয় এবং বৌদ্ধ ধ্যান-ধারণায়, পূজা পদ্ধতিতে গুহ্য তন্ত্রের রীতিনীতি প্রসার লাভ করে। শুধু মন্ত্র নয়, ধারণী, মন্ডল ও মুদ্রা বিষয়ও ছিল। মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে নানা বোধিস্বত্ব, নানা দেবদেবীর ছড়াছড়ি, মহাযানের দুর্বোধ্য দর্শন অপেক্ষা মন্ত্রতন্ত্রে পূজা পাঠ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের নিকট অতি সহজ মনে হওয়াতে পালযুগে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে-তন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি।

বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম যারা প্রচার করেছেন তাদেরকে বলে সিদ্ধাচার্য। এদের অনেকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং তান্ত্রিক সাধনার জন্য তারা যে বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করেন তাই পরবর্তীতে 'চর্যাপদ' নামে আখ্যায়িত হয়।[৩২] সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে সরহপাদ, নাগার্জুন,

Dhaka University Institutional Repository

লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নপাদ, ভূসুক, কুক্কুরীপাদ প্রমুখের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মকে তন্ত্রবাদের মাধ্যমে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন যখন ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকতার সাথে তা মিশে যেতে সহজতর হয়েছিল। হিন্দুতন্ত্রবাদ বিশেষত শক্তিবাদের সাথে বৌদ্ধতন্ত্রবাদের মিলনের ফলে একদিকে উদ্ভব হয়েছে নতুন শক্তি মতবাদের এবং অন্যদিকে সাধারণ লোকের মনে জন্ম হয়েছে জনপ্রিয় কিছু কিছু ধর্ম বিশ্বাসেরও। এগুলো হচ্ছে নাথধর্ম, কৌলধর্ম, অবধূত, সহজিয়া আউল, বাউল।

পাল রাজারা ছিলেন বুদ্ধের একান্ত ভক্ত এবং বাঙ্গালা ও বিহারের বৌদ্ধধর্মের উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন এবং সে সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও পৃষ্টপোষকতা করেছেন। ষষ্ঠ পাল নৃপতি নারায়ণপাল স্বয়ং একটি শৈব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৩] পাল রাজাদের সময়েই সবচেয়ে বেশী বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয় এবং এ বংশের রাজত্বকালের বৌদ্ধ নিদর্শন সমূহ এত বেশী আবিষ্কৃত হয়েছে যা অন্য সময়ের হয় নি। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে ধর্মপাল তার রাজত্বকালে পঞ্চাশটি বিহার নির্মাণ করেন। ধর্মপাল প্রাচীন বাংলাদেশে ৫০ টি মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন, তন্মধ্যে ময়নামতীর পাহাড়িয়া অঞ্চলেই দৈর্ঘ্য ১১ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইলের মধ্যে, ২০টি বিহার অবস্থিত ছিল।[৩৪]

ধর্মপাল তাঁর রাজত্বকালে মগধে গঙ্গা নদীর ধারে পাহাড় শীর্ষে বিক্রমশীল মহাবিহার [৩৫] বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলে সোমপুরী বিহার[৩৬], ঢাকার নিকটে মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরী বিহার[৩৭], মগধের সন্নিকটে বাংলার কোন এক স্থানে ত্রৈকূট বিহার[৩৮] উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর শহর থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে বানগড় গ্রামে দেবীকোট বিহার[৩৯] পাহাড়পুর থেকে আটাশ মাইল পশ্চিমে দীপগঞ্জে হলুদ বিহার[৪০] প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রীঃ) বরেন্দ্রাঞ্চলে জগদ্দল মহাবিহার ও বর্তমান বিহার প্রদেশের ওদন্ত পুরী মহাবিহারটিও প্রতিষ্ঠা করেন।[৪১]

এ সময়ে চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে 'পন্ডিত' বিহার নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ মহাবিহার ছিল যা সে সময়ে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষত তান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল।[৪২] বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামে অবস্থিত ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

মহাবিহার পন্ডিত বিহার।[৪৩] বৌদ্ধ-সামন্তরাজ শ্রী জয়চন্দ্র তার রাজ্যের রাজধানীতে এই ঐতিহ্যময় পন্ডিত বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০০ বৎসর বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম পাল রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় সমৃদ্ধ হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়ে সে সময়কার ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-ভাস্কর্য ইত্যাদিতে। এ সময়ে মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করে বাংলার বৌদ্ধ সমাজ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে একটি গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।[৪৪] পাল শাসনামলে যে সব বাঙালী পন্ডিতগণ তাঁদের পান্ডিত্য, দর্শন সাহিত্যের সৃজনশীল প্রতিভা দিয়ে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোকিত করেছেন তাঁরা হলেন- শান্তরক্ষিত, জেতারি, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, নারোপা, তিলোপা, কুমার ঘোষ, বীরদেব, রত্নাকর শান্তি, দিবাকর চন্দ্র, কুমার চন্দ্র, কুমার বজ্র, দানশীল, পুত্তলী, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মন, বোধিভদ্র, মোক্ষকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর, বনরতন প্রমুখ[৪৫]। পাল যুগের বাংলার বৌদ্ধ জ্যোতিষ্ক নামে খ্যাত বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৫০ খ্রীঃ) বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে তিব্বত গমন করেন। বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের অন্যতম অতীশ দীপঙ্কর জীবনের শেষ তের বছর তিব্বতে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে সেখানকার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সূচনা করেছিলেন এক নতুন অধ্যায়ের। ১৯৪টি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।[৪৬] ঢাকার অনতিদূরে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই দার্শনিক পন্ডিত তুষার সমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রদব্রজে অতিক্রম করে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র চীনে বুদ্ধের অবতার হিসেবে তাঁকে এখনো পূজা করা হয়। তাঁর স্মৃতির সম্মানে ঢাকা বিহারের একটি হলকে অতীশ হল নামকরণ করা হয়েছে। চন্দ্রগর্ভ ছিল তার বাল্যনাম। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিত তাঁকে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' নাম দেন এবং পরে 'অতীশ' নামের তিব্বতীয় উপাধিটি তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়।[৪৭]

সে সময়ে ধীমান ও বীতপালের মত কীর্তিমান চিত্রকর ও ভাস্কর্য শিল্পীদেরও আবির্ভাব ঘটে। পিতা-পুত্রের ছাত্র বা শিক্ষার্থীরা প্রাচ্যের এক একটি শিল্পকেন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন। এদের সাথে জয়া, পরাজয়া ও বিজয়া নাম্মী আরও তিনজন অসাধারণ শিল্পীর নাম লামা তারানাথ উল্লেখ করেন যাদের আবাসস্থল তিনি দক্ষিণের বাংলাদেশকেই নির্দেশ করেছেন।[৪৮] বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বাংলা ভাষায় আদি কবি। তাঁদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য রচিত হয়। চর্যাপদ এর উজ্জ্বল নিদর্শন। পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, সহজিয়া, শক্তি বাউল গানের উপর। পাল আমল থেকে বাঙালীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং পালযুগই ছিল বাংলার বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগ। এ যুগেই বাংলার সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে এবং বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন দেশেও এ ধর্ম প্রসারিত হয় পাল রাজাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। সম্রাট অশোকের আন্তরিকতায় সে সময়ে এ ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়। পাল রাজত্বকালেই বৌদ্ধধর্ম চরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে এ ধর্মে নানা বিবর্তন শুরু হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি

সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার শুরু হয় এবং পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম উন্নতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে। এরপরও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম তার প্রসারিত বলয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে। সম্রাট অশোক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে এবং তাঁর পরবর্তী শাসকগণ এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পালরাজগণ এ ধর্মের সর্ববিধ উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে সেন-বর্মণদের শাসনামলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয় এবং মুসলমান বিজেতা বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

সেন ও বর্মন শাসনামলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বাংলাদেশে বর্মন রাজবংশের উদ্ভব হয় একাদশ শতকে। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রলিপি থেকে এ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তারা আনুমানিক ১০৭৩ থেকে খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। সেন বংশ একাদশ শতাব্দীর বাংলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমশ এই রাষ্ট্র একটি অনতি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সেন বংশের সব রাজাই ছিলেন ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী।

Dhaka University Institutional Repository

সেন ও বর্মন রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্টপোষকতায় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ সময় বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় সহানুভূতি ও পৃষ্টপোষকতা হারায় এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত ধ্বংশের দিকে এগিয়ে যায়।[৪৯]

সেন বর্মন আমলে বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অন্যায় আচরণ, অত্যাচার, বিদ্বেষ ইত্যাদি তাদেরকে ব্যাপক ভাবে শংকিত করেছিল। শংকর বিজয়, শুন্য পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থাদিতে এসবের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন, "হিন্দুরা-শুধু বৌদ্ধদের অত্যাচার ও তাদের ধর্ম নষ্ট করে ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা এতকালের সঞ্চিত বৌদ্ধ ভান্ডারের সর্বৈব লুণ্ঠন করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির উপর স্বীয় নামাঙ্কের ছাপ দিয়ে সামগ্রিকভাবে সর্ববিধ নিজস্ব করে নিয়েছেন- হিন্দুদের পরবর্তী ন্যায়, দর্শন, ধর্ম শাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে এ লুণ্ঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে হিন্দুগণ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যময় ইতিহাস বিলোপ প্রাপ্ত হয়েছে, এর জন্য হিন্দুগণই একমাত্র দায়ী।"[৫০] সুতরাং রাজকীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে এবং রাজাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন স্থান থেকে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এ সকল কারণে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশে সংকুচিত হতে থাকে এবং অয়োদশ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভৌগলিক ও রাজনৈতিক কারণে তখনো বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রয়ে যায় চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে।

ইসলামের আবির্ভাব ও বৌদ্ধদের প্রতিক্রিয়া

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি সুরক্ষিত বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মনে করেছিলেন দূর্গ এবং মুন্ডিত মস্তক পীতবসনধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে মনে করেছিলেন পর্তুগীজ সৈন্য। এই ভ্রান্ত ধারণায় বাংলার হাজার বৎসরের বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম ও বিদ্যালয়গুলি বখতিয়ারের তরবারী ও অশ্বখুরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।[৫১] বিহারের আবাসিক ভিক্ষুসংঘকে তুর্কী সৈন্যরা একের পর এক হত্যা করে এবং এর পর লুণ্ঠন শুরু করে। এ সময় বখতিয়ার খলজী বিশাল এক গ্রন্থাগার লক্ষ্য করলেন। কিন্তু এখানকার পুঁথি ও গ্রন্থসমূহ পাঠ করার মত জীবিত আর কাউকে পাওয়া যায় নি। নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগারে অগ্নি সংযোগ করা হলে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাবার পর বখতিয়ার খলজী জানতে পারেন, এটা একটা সুসমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়। সম্ভবত এ কারণেই তিনি সমগ্র দেশটির নাম দিয়েছিলেন বিহার।[৫২]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে প্রথমে মগধ ও পরে ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামগুলি ধ্বংশস্তূপে পরিণত হয়। সম্ভবত এ সময়ের মধ্যে বাংলায় সর্বশেষ আশ্রয়স্থল থেকে বিতাড়িত হলে তাঁরা আত্মরক্ষার্থে তিব্বত বা নেপাল গমন করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার যেহেতু নির্ভর করে অনেকটা বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের উপর, অতএব বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার সাথে সাথে বৌদ্ধ ধর্ম এ অঞ্চল থেকে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।[৫৩]

সুলতানী শাসনামলের প্রারম্ভে বৌদ্ধ বিহারকে মসজিদ ও ফকিরের দরগায় রূপান্তর করা হয়েছে। রাজধর্মের প্রতাপে মুসলমানেরা বহু বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংস করে তার উপর মসজিদ, ফকিরের দরগাহ নির্মাণ করেছেন।[৫৪]

সেন ও সুলতানী আমলে অত্যাচারিত বৌদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে, অন্য অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং বাকী অংশ উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম, আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি পাহাড়ী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। বর্তমানে একমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ব্যতীত বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে।[৫৫]

বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ

প্রাচীনকালে থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধরা ছিল হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধমতের অনুসারী। পরবর্তীতে মহাযানী মতবাদের প্রভাব পড়ে পাল ও দেব বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে। তান্ত্রিক ও সহজিয়া রীতিনীতির সংস্পর্শে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হয় এসময়েই। ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন তান্ত্রিক সহজযানের আদর্শ ও নানা ধরনের মতাদর্শ প্রচলিত হয়। দীর্ঘদিন মহাযানী প্রভাবে থাকার পর আবার উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন ভাবে থেরবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য মণীষিগণ সর্বপ্রথম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম চর্চায় এগিয়ে আসে। এরপর ধীরে ধীরে এদেশের মণীষিগণেরও এ বিষয়ে তাদের চিন্তা-

Dhaka University Institutional Repository

চেতনাকে অগ্রসর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে একসময় বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ সম্বলিত মতবাদ থেরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় মহাযান অধ্যুষিত বাংলাদেশে।

সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর অবদান

বাংলাদেশে থেরবাদী মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন সংঘরাজ সারমেধ মহাথের। সংঘরাজ সারমেধ বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ থেকে হিন্দু দেবদেবীর পূজা, মুসলমান পীরাদির সিন্নিদান প্রথা, দীক্ষিত ভিক্ষুদের মধ্যে বিকালে ভোজন, বিবাহাদি ও সামাজিক কাজে ভিক্ষুদের যোগদান ইত্যাদি প্রথা দূর করেন। একই সাথে তিনি চেষ্টা করেন ভিক্ষুদের চীবর (অর্থাৎ পরিধেয় বিশেষ গৈরিক বস্ত্র), ভিক্ষাবৃত্তি, পরিবাস, উপসথ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত করা এবং ভিক্ষুদের পালি সূত্রাদি শিক্ষা দেয়া এভাবে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য যথাসধ্য চেষ্টা করেন সারমেধ মহাথের। তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৮৬৪ খ্রীঃ মহাযান অধ্যুষিত বাংলাদেশে থেরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ শুরু হয়।[৫৬]

চাকমা রাণী কালিন্দী ও ধর্মীয়- সংস্কার

সে সময় চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল চাকমা রাজ্য ছিল বৃটিশ সরকারের অধীনে একটি সামন্তরাজ্য। সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন রানী কালিন্দী (১৮৩০-১৮৭৩)। তিনি ছিলেন হিন্দু ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। সংঘরাজ এবং হারবাঙের গুনামেজু ভিক্ষু রানীর সাথে সাক্ষাৎ করে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন ১৮৫৭ সালে। রানী চাকমা ও মারমা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থেরবাদী মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।[৫৭]

ভিক্ষুসংঘের অবদান

বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রসারে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই ভূমিকা ছিল বিভিন্ন ভাবে-ধর্ম প্রচার করে, লেখনীর মাধ্যমে, ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। যেমন, অনাগরিক ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত ভারতের মহাবোধি সোসাইটি, কলকাতায় কৃপাশরণ মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত ধর্মাঙ্কুর সমিতি, বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন এবং চট্টগ্রামের কৃষ্ণ নাজির

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী এবং ভাগিরথ বড়ুয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Chittagong Buddhist Association- এসবই ভারতভূমিতে বৌদ্ধধর্মকে আবার পুনর্জাগরিত করে।

এছাড়া, ভিক্ষু, শ্রামণ ও অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিনীতির সংস্কার করেন। এভাবে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযান অধ্যুষিত বাংলাদেশে থেরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে থেকে সূচনা হয় বৌদ্ধ সমাজের নবজাগরণের এবং দ্রুতগতিতে বৌদ্ধ সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সারনী- ১
বিভিন্ন রাজবংশ/দেশের শাসনাধীন বাংলা

সময় কাল	রাজবংশ/দেশের নাম
৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী	গুপ্ত শাসনাধীনে বাংলার একাংশ
৬৩০-৭০০ খ্রী ঃ	সমতটে খড়্গ বংশ (বৌদ্ধ)
৭৫০-১১৫৫ খ্রী ঃ	পাল বংশের শাসনাধীনে বাংলা
৯০০-১০৫০ খ্রী ঃ	সমতটে চন্দ্র বংশ
৯৫০-১২৮৪ খ্রী ঃ	সমতট ও পট্টিকেরা রাজ্যে অন্যান্য বংশ
১০৯৫-১২২৫ খ্রী ঃ	সেন ও বর্মন শসনাধীন বাংলা
১২০২ খ্রী ঃ	বাংলায় মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর অভিযান
১২২৭-১৭৫৭ খ্রী ঃ	বিভিন্ন মুসলমান বংশের অধীনে বাংলা
১৫৮০-১৬৬৬ খ্রী ঃ	আরাকানের শাসনাধীনে চট্টগ্রাম
১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রী ঃ	ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলা
১৯৪৭ খ্রী ঃ	ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা
১৯৪৭-১৯৭১ খ্রী ঃ	পূর্ব পাকিস্তান রূপে বাংলায় পাকিস্তানী শাসন
১৯৭১ খ্রী ঃ	পাকিস্তানের অধীনতা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সূত্র ঃ Dr. Dilip Kumar Barua and Dr. Mitsuru Ando, *Syncretism in Bangladeshi Buddhism*, Japan, 2002, p. 6.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- বাঙালী বৌদ্ধ ও পাহাড়ী বৌদ্ধ। বাঙালী বৌদ্ধরা বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালী সংস্কৃতির অনুসারী এবং এরা সমতল এলাকায় বাস করে বলে এরা সমতলীয় বৌদ্ধ নামেও পরিচিত। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালী জেলাতে মূলত এদের বসবাস। পক্ষান্তরে পাহাড়ী বৌদ্ধ বা আরাকানী বৌদ্ধরা আরাকানী সংস্কৃতির অনুসারী ও আরাকানী বংশোদ্ভুত। এদের ভাষা ভিন্ন হলেও বাংলা ভাষাকেও আয়ত্ব করে। এদের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা প্রভৃতি উপজাতির লোক। চাকমা সম্প্রদায় বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে, মারমা সম্প্রদায় বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে, রাখাইন সম্প্রদায় বাস করে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমতল অঞ্চলে।[৫৮]

চট্টগ্রাম ও সমতলীয় বৌদ্ধ

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আগমন সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর প্রমাণ না পাওয়ার ফলে এর সঠিক সন তারিখ নির্দিষ্ট করাও সম্ভব হয়নি। তবে খ্রীষ্টীয় সনের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও বৌদ্ধরা তাদের উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চট্টগ্রাম ও তার সংলগ্ন আরাকান অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। ক্রমশঃ চট্টগ্রামই বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বৌদ্ধ-সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের এক সম্মেলনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিনিধি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন-

> "Chittagong was a great centre of Buddhist education from early time. Dipankar Sri Jnan left to preach Buddhism in Tibet from Chakrasla Vihar named after Dharmcakra, a wellknown religious seat of learning in Chittagong. According to Chinese pilgrim Huen Tsang the famous Pandit Vihar was situated in Chittagong but its exact site could not be discovered yet. During the ebb-tide of Buddhism in India our fore-fathers did not sacrifice the religion unlike other ancient Indian Buddhist but they any how could keep up their separate identity in a corner of India, (Chittagong). Now owing to the partition of Bengal,

Dhaka University Institutional Repository

the number of Buddhists has been reduced though the majority are in East Bengal. In Chittagong alone there are about 300 Vihars yet and are altogether nearly 600 Viharas in entire East Pakistan."[৫৯]

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের আরাকানের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম এবং আরাকান একই ভূখন্ড এবং এদের প্রাচীন ইতিহাস এক ও অভিন্ন। আরাকানের প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস 'রাজোয়াং' সূত্রে জানা যায় যে, ১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধের চন্দ্রসূর্য (১৪৬-১৯৮ খ্রীঃ) নামক এক সামন্ত এসে চট্টগ্রাম- আরাকানে রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাজা হন। সে সময়ে চট্টগ্রামে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। অপরদিকে মঙ্গোলীয় জাতির লোকদের বসবাস ছিল আরাকানে। রাজা চন্দ্রসূর্যের সাথে মগধ থেকে আগমনকারী সৈন্য সামন্তরা এই রাজ্যের অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে প্রথমে ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করে। এভাবে চট্টগ্রামের আরাকানী জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে মগধাগত বৌদ্ধরা বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষিত করে এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে পরবর্তীতে মগধাগত বৌদ্ধ ও চট্টগ্রামের আরাকানী বৌদ্ধদের সংমিশ্রণে প্রথম চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এরপর থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি নয়শ' বছরকাল কখনো অবিচ্ছিন্ন, কখনো বিচ্ছিন্নভাবে চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। সেই সূত্রে চট্টগ্রামের আদি বৌদ্ধদের রক্তে আরাকানী রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে।[৬০]

আহমদ শরীফ মনে করেন যে, চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আরাকানী। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে। কারণ কিছুকাল পূর্বেও আরাকানী নাম, পোষাক, খাদ্য ইত্যাদি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কংগ্রেসী জাতীয়তার প্রভাবে এরা হিন্দু আচারাদি গ্রহণ করেছে।[৬১]

কুমিল্লা জেলার লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ও বরুড়া থানাধীন ২৭ টি গ্রামে প্রায় নয় হাজার সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধদের অধিবাস দেখা যায়। তাদের সিংহ উপাধি তথাগত বুদ্ধের শাক্য সিংহ নামের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করা হয়। এ সম্পর্কে আরও বলা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী অজাতশত্রু প্রভৃতি নৃপতির নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্য একদল মগধাবাসী বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশে পালিয়ে যায়। মগধের অধিবাসী বলে তাদেরকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে মগ। এই

Dhaka University Institutional Repository

মগদের অনেকে পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশ থেকে বাংলা পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। কুমিল্লা জেলার সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধ সেই আদি মগধবাসীদের বংশধর।[৬২]

চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে প্রণবকুমার বড়ুয়া প্রচলিত জনশ্রুতিকে সমর্থন করে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণ শুরু হলে মগধের বৃজ্জি গোত্রের বৌদ্ধগণ পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলের স্বধর্মীদের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৬৩] তারা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে চট্টগ্রাম বিভাগে উপণীত হয়। চট্টগ্রাম তখন আরাকানের বৌদ্ধ রাজার অধীনে ছিল। এখানে আর ধর্মলোপের ভয় ছিল না। তারা ইতোপূর্বে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মগধ থেকে আগত চন্দ্রসূর্যের সঙ্গীদের উত্তর পুরুষদের সাথে মিলিত হয়। পরবর্তীতে তারা বড়ুয়া নামে পরিচিতি লাভ করে। নূতন চন্দ্র বড়ুয়াও প্রায় একই মতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ভারতে বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংশ করার ফলে সেখানে বৌদ্ধরা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ তিব্বত ও নেপাল চলে যায়। আর বৈশালীর বর্জি বংশীয় এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বহুসংখ্যক অনুচরসহ মগধ হতে পলায়ন করে পঁগার পথে আসাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাও নোয়াখালীতে এসে বসবাস করতে থাকে।[৬৪]

Statistical Account of Bengal (1876)' গ্রন্থে ঐতিহাসিক W.W. Hunter লিখেছেন-

> "The Rajbansis and Baruas of Chittagong are also of Burmese descent, but their origin is not purely Burmese... ... they are the offspring of Bangalee women by Burmese men and they have adopted Hindu customs and Bangalee language. Both Rajbansis and Baruas live in plains... The District census Report returns the number of Burmese Rajbansis at 10,852 and of Baruas at 381."[৬৫]

W.W. Hunter বর্ণিত এ তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দী শেষার্ধে চট্টগ্রামের আরাকানী বর্ণসংকর বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে রাজবংশী পদবী ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আর তখন বড়ুয়া পদবী ব্যবহার সবে মাত্র শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামের রাজবংশী ও বড়ুয়া অধিবাসীরা বর্মি (আরাকানি)

Dhaka University Institutional Repository

বংশোদ্ভূত। কিন্তু তাদের মূল উৎস বিশুদ্ধ বর্মি (আরাকানি) নয়। তারা বাঙালী নারী ও আরাকানী পুরুষের ঔরসজাত এবং তারা হিন্দু সংস্কৃতির অনুসারী ও বাংলা ভাষাভাষী।

খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। সম্ভবত এর পূর্বেও এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[৬৬] মৌর্য সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের ভিতরে ও বহির্ভারতে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করেছিলেন তন্মধ্যে উত্তর ও শোন স্থবিরের নেতৃত্বে একটি প্রচারক দল সুবর্নভূমিতে (নিম্ন বার্মা) প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সুবর্ণভূমি যাবার পথে চট্টগ্রামে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং প্রচারকদের মধ্যে কয়েকজন চট্টগ্রামে থেকে গিয়েছিলেন।[৬৭] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ) তার ভ্রমণবৃত্তান্তে পুন্ড্রবর্ধনে বুদ্ধের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে শ্রী চট্টলের (চট্টগ্রাম) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা সমতটের (পূর্ববঙ্গ) পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বহুসংখ্যক 'চৈত্য' বিশিষ্ট একটি পার্বত্য স্থান। 'চৈত্য' বলতে সাধারণত বৌদ্ধ মন্দিরই বুঝায়। তাই সম্ভবতঃ চৈত্য শব্দ থেকেই 'চট্ট' এবং 'চট্টল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ধারনা করা হয় হিউয়েন-সাঙ এর সময় নিশ্চয়ই এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল।[৬৮] দুর্লভ মল্লিকও তার 'গোবিন্দ চন্দ্র গীত' নামক গ্রন্থে চট্টগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং আরাকানের উত্তরে রম্ম নামক দেশের রাজধানীর নাম ছিল শ্রীচট্টল। চট্টগ্রামের এটাই প্রাচীন নাম। এছাড়া চট্টগ্রামে 'পন্ডিতবিহার' নামে একটি অন্যতম বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নবম শতাব্দীতে এই বিহারের এত প্রাধান্য ছিল যে, সমগ্র চট্টগ্রামই একসময় পন্ডিতবিহার নামে পরিচিত পেয়েছিল। আসলে এই পন্ডিতবিহার ছিল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ বা সংঘারাম যেখানে দেশবিদেশের বহু পন্ডিত প্রায়ই সম্মিলিত হতেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, চট্টগ্রামে নবম শতাব্দীর বহু আগেই বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[৬৯] এবং এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিপালনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকায় ধর্ম চর্চার পরিবেশ সবসময়েই ছিল উন্মুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় একই সময় বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় এবং চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব সেই সময় থেকেই। পরবর্তীতে আরাকানের বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বকালে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান সুদৃঢ় হয়

Dhaka University Institutional Repository

ও ধর্মচর্চার পথ সুগম হয়। ভারতে পুষ্যমিত্র প্রভৃতি হিন্দু রাজাদের দ্বারা এবং পরে তের শতকে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে ভারত ও বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা আক্রান্ত হলে বৌদ্ধদের কিছু অংশ সনাতন ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং কিছু অংশ বৌদ্ধ শাসিত অঞ্চল আরাকানের দিকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে এখানকার আদি বৌদ্ধদের সাথে মিশে যায়। পরে দীর্ঘকাল যাবৎ সনাতন ও ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে থাকার দরুন স্বাভাবিক ভাবেই চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

আরাকানী বৌদ্ধ

আরাকানী বংশোদ্ভূত এবং আরাকান থেকে আগত বৌদ্ধ অধিবাসীরা বাংলাদেশে আরাকানী বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামই প্রধানত বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল এবং আরাকানী বৌদ্ধদেরও বাস মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামেই। এদেরকে পাহাড়ী বৌদ্ধও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী থেকে এদের জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য আলাদা এবং বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে কোন যোগসূত্রও নেই আরাকানী বৌদ্ধদের।[১০] বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং এদের মধ্যে চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদের একটি উপদল, আর খিয়াংরা মারমা সম্প্রদায়ভূক্ত। পটুয়াখালীর বৌদ্ধরা মারমা জনগোষ্ঠীর অংশ।[১১] পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

আরাকান ও বাংলাদেশে মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে সম্পর্ক থাকায় বিভিন্ন সময়ে আরাকান থেকে বিভিন্ন জাতির লোক বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে প্রবেশ করে। এসব আরাকানী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দলটির নাম হচ্ছে মগ। বান্দরবান, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে মগদের দেখা মেলে অধিকহারে। খাগড়াছড়িতেও এর একটি ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে।[১২] বসবাসের ভিত্তিতে মগদেরকে প্রধান দুটো ভাগ করা যায়- (১) পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী মগ এবং (২) সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী মগ। পাহাড়ী মগদেরকে চিহ্নিত করা হয় 'মারমা' নামে এবং এরা বাস করে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে। অপর

Dhaka University Institutional Repository

দলটি পরিচিত 'রাখাইন' নামে যারা কক্সবাজার জেলা ও বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় বাস করে। বাংলাদেশে এসে মারমা ও রাখাইন নামে পরিচিত হলেও এরা আরাকানী জনগনেরই অংশ।[৭৩] সুতরাং বাংলাদেশের পাহাড়ী ও সমতল এলাকায় বসবাসকারী আরাকানীদের মগ নামে অভিহিত করা হয়। মগ শব্দটি 'মগধ' শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং আরাকানী বৌদ্ধ জনগন নিজেদেরকে মগধাগত বৌদ্ধদের বংশধর বলে মনে করে।[৬৬ ৭৪] Phayre-র মতে "The name 'Magh' originated from the ruling race of Magadha and relying on a Burmese oral Tradition, they were originally a kshatriya tribe of north India and migrated from Magadha to Burma through eastern Bengal. Subsequently they spread over Arakan from Burma.[৭৫]

হিন্দু মাত্রই যেমন আভিজাত্য লোভে নিজেকে আর্য বলে, মুসলিম মাত্রই যেমন আরবী-ইরানী বলে সগর্বে নিজের পরিচয় দেয়, আরাকানী রাজারা আর দেশবাসীরাও বৌদ্ধদের উদ্ভবক্ষেত্র মগধ থেকে আগত বলে আত্মপরিচয় দিতেন, সে সূত্রেই চট্টগ্রামের বৌদ্ধরাও হিন্দু-মুসলিমের কাছে 'মগ' বা 'মঘ' নামে পরিচিত।[৭৬]

এ মগ বৌদ্ধের প্রতি শব্দ মগধ>মগহ>মঘ>মগ। চট্টগ্রামবাসীর কাছে মগ শব্দটি আরাকানী ও বৌদ্ধের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। আরাকান রাজ্যে প্রচলিত সন 'মঘী সন'-রূপে চট্টগ্রামে প্রচলিত রয়েছে। চট্টগ্রামে ভূমির পরিমান 'মঘী কানি' (৪০ শতাংশ) হিসেবে চলে। এই মঘী প্রত্যক্ষে আরাকানী অর্থে এবং পরোক্ষে মগধ সম্ভূত আরাকানী বৌদ্ধ রাজকীয় অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু আর্মাডান পর্তুগীজ দস্যুদের সাথে যখন আরাকানী বৌদ্ধরা হাত মিলায় তখন থেকে মগেরা বাংলায় নিন্দিত ও ঘৃণ্য হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা সম্প্রদায়

মগ বা মারমাদের মত চাকমা সম্প্রদায়ও আদিতে ছিল আরাকানের অধিবাসী। পরবর্তীকালে আরাকানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা বাংলাদেশের পূর্বাংশে অর্থাৎ চট্টগ্রামে চলে আসে। চাকমাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে আরাকানে তাদের স্বাধীন রাজত্ব ছিল। 'চাদিগাং ছাড়া পালা' অর্থাৎ চট্টগ্রাম ছাড়ার পালা নামক চাকমাদের পালাগানে আদিতে তাদের বাসস্থান চম্পকনগর ছিল বলে উল্লেখ আছে। যেখান থেকে রাজ্যবিজয়ে বের হয়ে তারা আরাকান ও চট্টগ্রাম জয় করে এবং পরে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করে।

আরাকানী শাসনামলে চট্টগ্রামের আরাকানরাজের প্রতিনিধি ছিলেন মুকুট রায় এবং তাঁর রাজধানী ছিল চক্রশালা। ১৬৩৮ সালে আরাকানরাজ সুধর্মার দুর্ব্যবহার মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করলে চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ। ১৭৫৬ খৃঃ পুরো চট্টগ্রামে (টেকনাফ পর্যন্ত) মোগল অধিকার ছিল এবং সেখানে চাকমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের মিলিত রাজত্ব ছিল। সে সময়কার রাজা ছিলেন সেরমুস্ত খান (১৭৩৭-৫৮)।[৭৭] এ সম্পর্কে সুগত চাকমার বক্তব্য হলো "১৭৩১ থেকে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে সাংঘাতিক ধরনের রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয় এবং অরাজকতা দেখা দেয়। এর ফলে আরাকানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোও বিপদগ্রস্থ হয়। ফলে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খান ১৭৩৭ সালে আরাকানের দিক থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন এবং মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। .... তাঁর রাজ্যের সীমা উত্তরে ফেনী নদী থেকে দক্ষিণে শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান এবং পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (ঢাকা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড) থেকে কুকীরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৭৮]

সেরমুস্ত খান ১৭৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় শুকদেব রায়কে পুত্রবৎ লালন পালন করেন। শুকদেব রায় ১৭৫৮ সালে রাজা হন এবং রাজধানী আলী কদম থেকে রাঙ্গুনিয়ার পদুয়া ইউনিয়নের শিলক নদীর নিকটবর্তী একটি মনোরম স্থানে নিয়ে আসেন এবং তিনি স্থানটির নাম রাখেন 'শুকবিলাশ'। তিনি দেওয়ান উপাধির প্রবর্তক এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের এই উপাধি দিতেন। তাঁর আমলে ১৭৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট নবাব মীর কাসিম চট্টগ্রামের শাসনভার ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

হাতে তুলে দেন। শুকদেব রায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। রাজা জানবক্স খাঁ শুকবিলাস থেকে রাজধানী রাজানগরে এবং ১৮৬৮-৬৯ সালে রাজানগর থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করেন। 'রায়' মোগলদের দেওয়া উপাধি ছিল এবং তারা মোগলদের করদরাজ ছিলেন।[৭৯]

হ্যারী ভেরেলস্ট ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী নবাব মোহাম্মাদ রেজা খানের কাছ থেকে চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবে চাকমা রাজা এবং বোমাং রাজা ইংরেজদের অধীন হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করলেও ইংরেজরা প্রথম রাজস্ব আদায় আদায় ব্যতীত এখানকার উপজাতীয় শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি।

ইংরেজদের চট্টগ্রাম অধিকার করার সময়ে চাকমা রাজা ছিলেন শের জব্বর খান (১৭৫৮-৬৫ খ্রীঃ) চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা লাভের পর এই পার্বত্যাঞ্চল থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধিত হারে কর আদায় শুরু করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী। ধীরে ধীরে ইংরেজরা অধিক রাজস্ব দাবী করলে রাজাদের পক্ষে তা মেনে নেয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই চাকমা রাজাদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে। রাজা শেরদৌলত খান (১৭৬৫-৮২ খ্রীঃ) ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরেজদের খাজনা দেয়া বন্ধ করে দিলে তাঁর সেনাপতি রণু খানের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরুহয়। স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর ১৭৮২ খ্রীঃ রাজার মৃত্যুর ফলে তাঁর পুত্র জানবক্স খান চাকমাদের রাজা হন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে অধিক শক্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানবক্স খান ১৭৮৭ খ্রীঃ কলকাতায় গিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নিকট আত্মসমর্পন করলে ইংরেজদের সাথে বিরোধীতার অবসান ঘটে। ইংরেজগণ রাজাকে গোপনে প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং রাজাকে তার পূর্ব মর্যাদা ও জমিদারী ফেরত দেয়া হয়।[৮০] ১৭৮৯ খ্রীঃ থেকে ঠিকাদার মাধ্যমে কর আদায় ব্যবস্থা রহিত করে নগদ অর্থে সরাসরি পার্বত্য রাজাদের নিকট কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৭৯১ খ্রীঃ রাজাদের দেয় বাৎসরিক করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

এরপরে ইংরেজদেরকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জানবক্স খান নির্বিঘ্নে তাঁর রাজ্য শাসন করেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ ইংরেজরা প্রথম পার্বত্য রাজাদের সাথে কর আদায়ের ব্যাপারে সরাসরি যোগাযোগ করেন। জানবক্স খানের মৃত্যুর পরে তার দুই পুত্র টব্বর খান, জব্বর খান এবং পৌত্র ধরমবক্স খান (১৮১২-১৮৩২ খ্রীঃ) রাজা হন। ধরমবক্স খানের মৃত্যুর পর তদীয় মহিষী রানী কালিন্দী

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে ইংরেজরা ধীরে ধীরে এখানকার উপজাতীয় শাসনব্যবস্থায় সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৮৭৩ সালে রানী কালিন্দীর মৃত্যু হলে তার পৌত্র হরিশচন্দ্র রাজা হন। ১৮৮৫ সালে রাজা হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার ভুবন মোহন রায়কে রাজা মনোনীত করে।[৮১] রাজাদের নাম মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এরপর ১৯৩৫ সালে রাজা ভুবন মোহন রায়ের পুত্র নলিনাক্ষ রায় রাজা হন। তিনি ছিলেন বৃটিশ রাজত্বের শেষ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রথম রাজা। ১৯৫১ সালে রাজা নলিনাক্ষ রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ সালে রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন চাকমা রাজা।

রাখাইন

১৭৮৪ থেকে ১৭৯৮ খ্রীঃ আরাকানের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ চট্টগ্রামের দক্ষিণ- পূর্ব প্রান্তে বর্তমান কক্সবাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করে। ক্যাপ্টেন কক্সের হিসাব মতে, ১৭৯৯ সালের মধ্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার আরাকানী এ জেলায় প্রবেশ করে। ১৮১৪ সালের মধ্যে কক্সবাজারের কাছে রামুর ৮০ কিলোমিটার জুড়ে আরাকানী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ।[৮২] আরাকানী শরণার্থীরা পরবর্তীতে আরাকানে ফিরে যেতে অস্বীকার করলে ইংরেজ শাসকেরা তাদের চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে পুণর্বাসন করে। বাংলাদেশের রাখাইন ও মারমাদেরকে এসব আরাকানী শরণার্থীদের বংশধর বলে মনে করা হয়। "তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বর্মী এবং আরাকানীদের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সমগোত্রীয় লোক কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতেও রয়েছে। তারা সেখানে নিজেদের রাখাইন হিসেবে পরিচয় দেয়।"[৮৩] ১৮ শতকের শেষ পাদে ও ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল পরিস্কার ও ভূমি পুনরুদ্ধার কল্পে রাখাইনদের সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসিত করে।[৮৪] ফলে রাখাইনরা এদেশে সাময়িকভাবে আসলেও তাদের এ আগমন "পরিগণিত হয় প্রত্যাবর্তনহীন এক যাত্রায় এবং তারা পরিণত হয় এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীতে।" [৮৫] আরাকান থেকে আগত এসব মগ অধিবাসীরা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে এসে পরিচিত হয় 'রাখাইন' নামে। ফেইরীর মতে, আরাকানের রাখাইন উপজাতির নাম থেকে 'রাখাইন' নামটি এসেছে এবং রাখাইন প্রে-কে তারা তাদের আদিবাস বলে মনে করে।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

মারমা

চাকমারা বাস করে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তর-পূর্ব এলাকায়। চাকমাদের ফেলে আসা এলাকা দখল করে নেয় মারমারা। অতএব মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী নয়। তারা আরাকানী বহিরাগত এবং রাজনৈতিক কারণে শরণার্থী হয়ে দুবারে প্রথমে চট্টগ্রামে পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে।

বান্দরবানে আগমন

প্রথম দফায় ১৭৫৬ সালের দিকে কোংলাপ্রু স্বীয় অনুগামীসহ বান্দরবানে বসতি স্থাপন করে। তারা প্রথমে বসতি গড়ে মাতামুহুরী নদীর তীরে এবং পরে কক্সবাজারের রামু ও ইদগড় এবং আরো পরে ১৮০৪ সালের দিকে মহেশখালীতে অসে। এখানেও তারা স্থায়ী না হয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ১৮১২ সালে বান্দরবানের জঙ্গল পরিস্কার করে তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে। এখান থেকেই মারমাগণ ক্রমশ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বান্দরবানের রাজা বা বোমাং সার্কেলের মগ বা মারমা উপজাতির আদি পুরুষ হলেন এই কোংলাপ্রু এবং তার অনুগামীরা হল বোমাং সার্কেলের মগ বা মারমা উপজাতির আদি পুরুষ। বোমাং পরিবারের নিয়ম অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে বোমাং এর পুত্র বোমাং হতে পারেন না। পরিবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত ব্যক্তিই বোমাং পদ দাবী করতে পারেন।[৮৭]

খাগড়াছড়িতে আগমন

দ্বিতীয় দফায় ১৭৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ অবধি আরাকানী শরনার্থীরা চট্টগ্রামে আগমন করে। ১৭৮৪ সালে মারাচীর নেতৃত্বে আরাকানী শরনার্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপত্যকায় প্রবেশ করে। বান্দরবানের মারমাদের মত এরাও কক্সবাজারের আশে-পাশে অবস্থান করে এবং আরো পরে ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ র মধ্যে তারা সীতাকুন্ড পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সবশেষে ১৮২৬ খ্রীঃ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়ে বসতি স্থাপন করে। এরাই হলো মং সার্কেলের মারমা।[৮৮] ১৮৬৬ খ্রীঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের ৬৫৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে মং সার্কেল গঠন করেন তদানীন্তন জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি,এইচ,লুইন। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হওয়ার সময় এই জেলার উত্তরাঞ্চল ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের একটি অংশ এবং এতদঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী। সেসময় এখানকার

Dhaka University Institutional Repository

মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১,৩৯৫ জন এবং এর মধ্যে ত্রিপুরাদের সংখ্যা ছিল ১৮,৫১১ জন, মগদের সংখ্যা ৬,৭০৪ জন এবং চাকমা ৬১৮০ জন।[৮৯] সুতরাং এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাদের জন্য ব্রিটিশ সরকার কোন সার্কেল গঠন করেনি এবং ত্রিপুরাদের দাবী অগ্রাহ্য করে ত্রিপুরা ও চাকমাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্য মং সার্কেল গঠন করা হয়। ১৯০০ সালে এর সীমা এবং আয়তন নির্ধারণ করা হয়।[৯০]

মগ বা মারমারা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত হলেও এদের মধ্যে দুটি গোত্রই প্রধান এবং তাহলো পালিনসা ও রিগ্রিসা। মং সার্কেলে বাস কারে পালিনসা গোত্রের মারমারা এবং বোমাং সার্কেলে বাস করে রিগ্রিসা গোত্রের মারমাগণ।[৯১] চাকমা সার্কেলেও কিছু মগ বসবাস করে। দুই মগ দলেরই নিজেদের রাজা রয়েছে।[৯২] ১৭৬১ খ্রীঃ চট্টগ্রাম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভূক্ত হয়ে কোংলাপ্রু মগ বা মারমা গোষ্ঠীর দলপতি হিসেবে বান্দরবান এলাকার কর সংগ্রাহক নিযুক্ত হন।[৯৩] ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে গঠন করে। এই জেলার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন Captain Magrath. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় চন্দ্রঘোনাতে এবং ১৮৬৮ সালে তা রাঙামাটিতে স্থানান্তর করা হয়।[৯৪] ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করার ঘোষণা দেন।[৯৫] এ তিনটি সার্কেল হলো যথাক্রমে চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মারমা রাখাইনদের সংখ্যা এবং সার্কেলগুলির আয়তন নীচে দেখানো হলোঃ

সারণী-২

মারমা- রাখাইনদের সংখ্যা

স্থানের নাম	বৎসর	মোট জনসংখ্যা
কক্সবাজার শহর	১৭৯৯ খৃঃ ১৮৭২ খৃঃ	১০,০০০ ৩,২০৫
বান্দরবান জেলা	১৯০১	১৬,৬০৮
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলা	১৯৫১ ১৯৬১	১২,২৭৮ ১৬,৩৯৪

সূত্র ঃ A Mabud Khan, *The Maghs: A Buddhist Community in Bangladesh*, p. 51.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩
সার্কেলগুলির আয়তন

সার্কেলের নাম	আয়তন
বোমাং	৩,০৯৬ বর্গকিলোমিটার
মং	৯৫১ বর্গকিলোমিটার

সূত্র ঃ A Mabud Khan, *The Maghs: A Buddhist Community in Bangladesh*, p. 106.

১৯০১ সালের সেন্সাস অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সার্কেলের মধ্যে চাকমা সার্কেলে ছিলেন রাজা ভুবন মোহন রায়, বোমাং সার্কেলে রাজা কোলাপ্রু এবং মং সার্কেলে রাজা নেত্রুসা। এ তিনটি সার্কেলের সদর ছিল যথাক্রমে রাঙামাটি, বান্দরবান ও মানিকছড়ি। এ তিনটি সার্কেলের রাজাদের সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। নিম্নে সার্কেলগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণী-৪
সার্কেলের আয়তন ও লোকসংখ্যা

সার্কেল	আয়তন	মোট লোক - সংখ্যা	ঘনত্ব	চাকমাদের সংখ্যা	মগ বা মারমাদের সংখ্যা
চাকমা	২,৪২১	৪৮,৭৯২	২৯.৪	৩৬,২০৭	৬,২২৩
বোমাং	২,০৬৮	৪৪,০৭২	৩০.৫৬	১,৯৪২	২১,৭৭৯
মং	৬৫৩	৩১,৮৯৮	৪৮.৮	৬,১৮০	১৮,৫১১

সূত্র ঃ R. H. S. Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts*, Delhi, p. 15-16.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় বৌদ্ধ জনগণের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব

প্রাচীনকালে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও পরবর্তীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন কারণে সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়া কুমিল্লা, নোয়াখালী ও পটুয়াখালী জেলায় ও কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করে। ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথমদিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে জনসংখ্যার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহলো-

সারণী- ৫
বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

মুসলমান	৫৩.৫৫ শতকরা হার
হিন্দু	৪৩.৭২ শতকরা হার
প্রাণবাদী	১.৭৯ শতকরা হার
বৌদ্ধ	০.৫৮ শতকরা হার
খ্রিষ্টান	০.৩১ শতকরা হার
অন্যান্য	০.০৫ শতকরা হার

সূত্র ঃ *Census of India, 1921* Report by W.H. Thompson, volume v, Bengal, part-1, Calcutta, 1923, p. 156.

ধর্মীয় দিক থেকে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশী এবং এরপর রয়েছে হিন্দু। জড়োপাসক, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ফলে বৌদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা বেশী।[৯৬]

১৮৮১ খ্রিঃ–১৯৩১ খ্রিঃ সময়কালে জনসংখ্যার চিত্র

নিম্নে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জরীপের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সাথে বৌদ্ধ জনসংখ্যর তুলনামূলক বৃদ্ধি দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬

১৮৮১খ্রিঃ-১৯৩১খ্রিঃ সময়কালে প্রত্যেক শুমারীতে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা।

বছর	মুসলমান	হিন্দু	উপজাতীয় ধর্ম	বৌদ্ধ	খ্রিষ্টান	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৮১	১৩,৩৯১,৪২৬	১৮,০৭১,২৯৬	৩১৩,০৮৯	১৫৫,১০৬	৭২,২৮৯	১০,১৩১
১৮৯১	২০,১৭৪,৮৩২	১৮,৯৭৮,৩০০	৩৬৪,৮২০	১৯৩,৬৪৫	৮২,২৩৯	১৪৬৩২
১৯০১	২১,৯৫৪,৯৫৫	২০,১৫৫,০৭৪	৪১২,৫৯৪	২১৬,৫০৬	১০৬,৫৯৬	১৭,৯৮৬
১৯১১	২৪,২৩৭,২২৮	২০,৯৪৮,৩৫৭	৭৩০,৭৮০	২৪৬,৮৬৬	১২৯,৭৪৬	১৮,৬৬৫

সূত্র ঃ *Census of India, 193, Vol-V, Report by A.E Porter M.A, Bengal & Sikkim, part-1, Calcutta, 1933, p-387.*

১৮৯১ সালের জরীপে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ জনসংখ্যার যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

সারণী- ৭

১৮৯১ সালের শুমারীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্র চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসংখ্যা

অঞ্চল	বৌদ্ধ জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা হার
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১১৮,৭৬২	৬৮.৫
সদর মহকুমা	৬৮,৫৪৫	৮০.৮
বান্দরবন মহকুমা	৩৩,৬৩৫	৬৩.৭
রামগড় মহকুমা	১৬,৫৮২	৪৬.৫
চট্টগ্রাম জেলা	৭২,৪০২	৪.৫
সদর মহকুমা	৪৬,৪০৯	৩.৫
কক্সবাজার মহকুমা	২৬,০৯৩	৯.১
ত্রিপুরা রাজ্য	১০,১৪৭	৩.৩

সূত্র ঃ *Census of Pakistan Population 1961,* Tables & Report by H. H. Nomani, S. K. p. II-74, II-103. Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪১ সালে বৌদ্ধ জনসংখ্যা

১৯৪১ সালের জরীপেও অধিকহারে বৌদ্ধদের বসবাস মূলত দেখা যায় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং- এ। চট্টগ্রামেই এদের ৮১% বসবাস করে। কক্সবাজার, পটিয়া ও বোয়ালখালীতে বৌদ্ধরা রয়েছে অধিক হারে। এই অঞ্চলগুলিতে আরাকানী মগদেরই দেখা যেত যারা উন্নত ও সভ্য হয়ে বড়ুয়া জাতিতে পরিণত হয়েছে। এ বৎসরের জরীপে বৌদ্ধদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৫৪,২৮৫ জন। বাংলার বিভিন্ন অংশে সে সময় বৌদ্ধ জনগণের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ-

সারণী-৮
১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ জনসংখ্যা

পশ্চিম বঙ্গ	৪৯,১৪৯
ভারতীয় রাজ্যসমূহ	৭,৭২৫
পূর্ব বঙ্গ	৯৭,৪১১

সূত্র ঃ S.P. Chatterjee, *Bengal in Maps*, Calcutta, 1945, Page-54.

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ জনসংখ্যা ঃ

ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র- গঠিত হলে পূর্ব বাংলা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। এ সময় ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে যে জরীপকার্য সম্পন্ন হয় তাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৯
১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	নিম্ন বর্ণ	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পূর্ব পাকিস্তান	৪,১৯,৩২,৩২৯	৩,২২,২৬,৬৩৯	৪১,৮৭,৩৫৩	৫০,৫২,২৫০	১০৬,৫০৭	৩,১৮,৯৫১	৪০,৬২৯
রাজশাহী বিভাগ	৯৩,৩৮,৪৫৩	৭৪,১৩,০৯৪	৫,৯৭,৭৭৬	১৩,১৪,১৭০	১১,৬৪৫	২৪৮	১,৫২০
খুলনা বিভাগ	৮২,৪০,২৩৫	৫৯,৫৮,৩০৯	৭,৬৪,২৩৬	১৪,৭৯,৭৩৫	২১,০১০	১৬,৪৭৫	৪৭০
ঢাকা বিভাগ	১,২৬,৩১,৮৭১	৯৯,৭৬,১৪২	১১,৫০,১৫৪	১৪,৩৪,১২০	৬১,৪৯৭	৮৩১	৯,১২৭
চট্টগ্রাম বিভাগ	১,১৭,২১,৭৭০	৮৮,৭৯,০৯৪	১৬,৭৫,১৮৭	৮,২৪,২২৫	১২,৩৫৫	৩০১,৩৯৭	২৯,৫১২
চট্টগ্রাম জেলা	২৫,১১,৭৮৫	১৯,৫২,১২৮	৩,৭৬,৫৫০	৯৫,৭৬০	১৯১১	৮২,৬৭৯	২,৭৫৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২,৮৭,২৭৪	১৮,০৭০	৩৪,২৫৪	৬,৭৩০	৩৭৪৫	২১৫,০০০	৯,৪৭৫

সূত্র ঃ *Census of Pakistan Population 1961,* Tables & Report by H. H. Nomani, S. K. p. II-98, II-103. Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১০
১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	নিম্ন বর্ণ	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পূর্ব পাকিস্তান	৫,০৮,৪০,২৩৫	৪,০৮,৯০,৪৮১	৪৩,৮৬,৬২৩	৪৯,৯৩,০৪৬	১,৪৮,৯০৩	৩,৭৩,৮৬৭	৪৭,৩১৫
রাজশাহী বিভাগ	১,১৮,৫০,০৮৯	৪৭,৫৪,৮৩৩	৭,১৩,০২২	১৩,৩৬,১১৯	২৩,১৪১	১,৭৪৫	২১,২২৯
খুলনা বিভাগ	১,০০,৬৬,৯০০	৭৬,১৭,২৯৯	৮,৬৬,৫৩৮	১৫,৪১,৪৮২	২৭,৬৩৬	১২,৬২৩	১,৩২২
ঢাকা বিভাগ	১,৫২,৯৩,৫৯৬	১২৬,৬৯,৭৪৬	১১,৫৯,৬৩০	১৩,৭০,১২১	৭৭,৬৪৯	১,০৩০	১৫,৪২০
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৩,৬২৯,৬৫০	১,০৮,৪৮,৬০৩	১৬,৪৭,৪৩৩	৭,৪৫,৩২৪	২০,৪৭৭	৩৫৮,৪৬৯	৯,৩৪৪
চট্টগ্রাম জেলা	২৯,৮২,৯৩১	২৪,০৭,৩৬৮	৩,৯৮,০৫৪	৯৬,০৭২	৩,০৩৬	৭৮,৩৭০	৩১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩,৮৫,০৭৯	৪৫,৩২২	৪৩,৭৫৮	৩,৮৮৬	১০,১৬০	২,৭৫,৬৮১	৬,২৭২

সূত্র ঃ *Census of Pakistan Population 1961,* Tables & Report by H. H. Nomani, S. K. p. II-101, II-103. Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগেই বৌদ্ধরা অধিক সংখ্যক বাস করে। আবার চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জনসংখ্যা

১৯৫১ খ্রীঃ ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো।

সারণী- ১১

১৯৫১ খ্রীঃ ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসংখ্যা

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা		বৌদ্ধ জনসংখ্যা	
চট্টগ্রাম সদর (উত্তর) মহকুমা	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
	১২,৭২,৯৪৫	১৫,২৩,৩৬১		৩৯,৬৮৭
চট্টগ্রাম সদর (দক্ষিণ) মহকুমা	৭,৯৯,৯২৬	৯২০,৪৯৩	–	২২,০৬৬
কক্সবাজার মহকুমা	৪,৩৮,৯১৪	৫৩৯,০৭৭	–	১৬,৬১৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম রামগড় মহাকুমা	৯২,৬৭১	১৩৫,১৩৪	–	৮৯,৩৭৬
রাঙ্গামাটি মহকুমা বান্দরবন মহকুমা	১,২৪,৩৭৮	১৬৩,৫২৩	–	১,২৬,৬৬৫
	৭০,২২৫	৮৬,৪২২	–	৫৯,৩১০

সূত্র ঃ *Census of Pakistan Population 1961*, Tables & Report by H. H. Nomani, S. K. p. II-102, II-103. Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

সুতরাং ১৯৬১ সালের জরীপে পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ জনগণের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৭৩,৮৬৭ জন। এদের মধ্যে ৩,৫৪,০০০ জনই চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭১.৫৯% জন লোকই হলো বৌদ্ধ।[৭৭]

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সমাজ ও সংস্কৃতি

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত, এরা হলো- বাঙালী বৌদ্ধ সামাজ ও পাহাড়ী বৌদ্ধ সমাজ। পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা প্রভৃতি উপজাতির লোক। তঞ্চঙ্গ্যারা পূর্বে চাকমা জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীতে তারা পৃথক একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পাহাড়ী সকল বৌদ্ধদের জীবনযাপনের রীতিনীতি-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম হলেও বাঙালী বৌদ্ধদের থেকে তারা সম্পূর্ণভাবেই পৃথক। কিছু কিছু উৎসব ও পূজাপার্বনের ক্ষেত্রে বাঙালী ও পাহাড়ী বৌদ্ধদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পাহাড়ীদের নিজস্ব কিছু পূজা-পার্বণ রয়েছে যা তাদের একান্তই নিজস্ব রীতিনীতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানে না। কিন্তু বাঙালী বৌদ্ধদের সকলেই সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই থেরবাদী মতবাদের নিয়ম-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়।

বৌদ্ধ গৃহী সমাজ ও ভিক্ষু সমাজের রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বৌদ্ধ গৃহীদের জীবনযাত্রা

গৃহীদের জন্য বুদ্ধ বলেছেন, সকল গৃহীকেই শীলবান হতে হবে- ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালী বৌদ্ধরা বুদ্ধের এই আসল ধর্ম সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কেননা পাল-গুপ্ত যুগের পরে অন্যান্য ধর্মের সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্ম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে নতুন করে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর ধর্মীয় দিক থেকে উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সকল বিষয়ে বৌদ্ধরা উন্নত হয়েছেন। বিগত একশত বছরে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হওয়ায় বৌদ্ধ সমাজে এখন শুধু কৃষক শ্রেণীর লোকই নয়, চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে এবং ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, অধ্যাপক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র-বাণিজ্য, প্রাণীবাণিজ্য, মাংশ-বাণিজ্য, মৎস্য বাণিজ্য ইত্যাদি বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত নেই। এছাড়া চৌর্যবৃত্তি এবং ভিখারী এদের সমাজে অনুপস্থিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে গৃহীরা সকলেই এক এবং তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম মেনে চলেন। বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকের বাড়ীতেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বুদ্ধের মূর্তি অথবা বুদ্ধের ছবি আছে যেখানে পূর্বাহ্নে ফল-ফুল, গন্ধদ্রব্য, অন্নব্যাঞ্জনাদি এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ বা মোমবাতি ও গন্ধ-ধূপাদি দিয়ে পূজা করা হয়। সাধারণত বুদ্ধ মূর্তিটি বসার ঘরে স্থাপন করা হয়, তবে পূজার সুবিধার জন্য অন্য ঘরেও অনেকে স্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের বৌদ্ধদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তাঁরা সীবলী স্থবিরের পূজা করেন। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধ পরিবারে সীবলী স্থবিরের ছবি আছে। সীবলী স্থবির বুদ্ধের এক প্রধান শিষ্য এবং যখনই যা তিনি পেতে ইচ্ছা করতেন তখনই তা পেয়ে যেতেন।[৯৮]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে, মানুষের জন্য যাঁরা স্বীয় কর্মের দ্বারা অতিমানবতা অর্জন করেছেন তাঁদের পূজা করা এবং তাঁদের আদর্শ অনুকরণ করা। সেজন্য দেখা যায় বর্তমান শতাব্দীতে চট্টগ্রামে যে সমস্ত ভিক্ষু সমাজসেবা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি করে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁদেরকেও এদেশের বৌদ্ধরা পূজা করে থাকেন।

বৌদ্ধরা বুদ্ধের কর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী। ভাল কাজ করলে ফল ভাল হবে এবং খারাপ কাজ করলে ফল খারাপ হবে- এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধদের বিশ্বাস যে, কর্মের বীজের এমন তীব্রগতি যে তা ষোল আনা ফল দেবেই। অতীত জন্মে কোন মানুষ যদি বেশী পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে এইজন্মে হাজার পূণ্যকাজ করলেও তিনি আশানুরূপ ফল পাবেন না। অর্থাৎ পূর্ব জন্মের ফলও তিনি ভোগ করবেন, আবার ইহজন্মের সঞ্চিত পূণ্যের ফলও তিনি ভোগ করবেন- এটাই বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু

বাংলাদেশের ভিক্ষুরা থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম পালন এবং তাঁরা পালি বিনয়পিটকের নিয়মকানুন মেনে চলেন। শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরাও থেরবাদী। বাংলাদেশের প্রত্যেক গৃহী বৌদ্ধকেই জীবনে অন্তত একবার বিশেষতঃ বিবাহের পূর্বে প্রব্রজিত হতে হয়। পরে তাকে ভিক্ষু না হলেও চলে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন যাপন বস্তুত গৃহীদের দানের উপরই নির্ভর করে। ভিক্ষুরা সাধারণত বিহারেই বাস করেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে খাওয়াই ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম।[৯৯]

ভিক্ষু জীবনও সংসার ধর্ম

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিয়ে করতে পারেন না এবং গার্হস্থ্য ধর্মের কোন কিছুর সাথেও নিজেকে জড়াতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী বৌদ্ধদের সমাজব্যবস্থা

বৌদ্ধদের সামাজিক ক্রিয়াকান্ড

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং তাঁরা বৌদ্ধ বিনয়-পিটকের বিধান মেনে চলেন। অপরপক্ষে যারা গৃহী-বৌদ্ধ বা গৃহস্থ সমাজ তাদের বেশ কিছু সামাজিক আইন-কানুন, আচার-বিধি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি রয়েছে যা তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় পালন করে থাকেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ গৃহস্থ সমাজের মধ্যে সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন বা দীক্ষা ইত্যাদি ক্রিয়া-কান্ডের সময় গণক ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে শুভদিন ও শুভক্ষণ বেছে নেয়ার রীতি এদের মধ্যে রয়েছে।[১০০]

আরাকানী বৌদ্ধদের সমাজ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে আরাকানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আরাকানী বৌদ্ধদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমা জাতির একটি শাখা। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এদের বসবাস।[৯২ ১০১] সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙালী সমতলীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও পাহাড়ী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি মোটামুটি একই রকম। বান্দরবান, মানিকছড়ি, কক্সবাজার, রামু, পটুয়াখালীতে অবস্থিত মারমাদের নৃতাত্ত্বিক গঠন, ভাষা সংস্কৃতি, লৌকিকতা, খাদ্য গ্রহণ, আচার-আচরণ এবং প্রথার দিক থেকে একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সকলেই বর্মী রাজার পরাজিত শত্রু শরণার্থী। কক্সবাজার, রামু এলাকার মারমা-রাখাইনদের সাথে পটুয়াখালীর মারমা-রাখাইনদের বৈবাহিক সম্পর্কে প্রচলন রয়েছে।[১০২]

পাহাড়ী বৌদ্ধদের বাসস্থান

চাকমাদের একটি নিজস্ব সামাজিক কাঠামো রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে চাকমা সমাজ গড়ে উঠেছে এবং বর্তমানেও টিকে আছে। চাকমা সমাজে প্রধান হলেন চাকমা রাজা। সাধারণত পাহাড়ী এলাকায় ছোট ছোট নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় মারমা-চাকমাদের গ্রাম গড়ে ওঠে।[১০৩] পাহাড়ী বৌদ্ধরা মাচা পেতে ঘর তৈরী করে।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যাভ্যাস

পাহাড়ীদের প্রধান খাদ্য ভাত এবং তারা ভাতের সাথে প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংশ এবং শাকসব্জি খেতে ভালবাসে। বৌদ্ধ ধর্মমতে মদ বা সুরা পান নিষিদ্ধ হলেও এটা তাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে ও পূজা-পার্বণে এর ব্যবহার বেশি হয়।

চাকমা বর্ণমালা, সাহিত্য-এবং রোগ চিকিৎসা প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব। বিভিন্ন প্রকার রোগ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি, তাবিজ ধারণ, তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ, মন্ত্রপাঠ এবং শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি চাকমাদের রোগ চিকিৎসার অঙ্গীভূত।[১০৪]

চাকমাদের বিবাহের রীতি পদ্ধতি

চাকমা সমাজে খালাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের রেওয়াজ আছে, কিন্তু চাচাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।[১০৫]

চাকমা সমাজের প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতি

চাকমা সমাজে কতগুলো রীতিনীতি প্রচলিত আছে যা তারা মেনে চলে। সমাজের প্রতি তাদের একতা ও সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় মালেইয়া (দাগানা), ভাতমজা দেনা, সাগা প্রভৃতি প্রচলিত প্রথা থেকে। বিভিন্ন কাজে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে এবং গ্রামবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে।[১০৬]

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও পূজা পার্বণ

সমতলীয় বা বাঙালী বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও পূজা পার্বণ

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব উৎসব ও পূজাপার্বণ-পদ্ধতি রয়েছে যা তাদের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির পরিচায়ক। উৎসব ও পূজাপার্বণ যে কোন ধর্মের অঙ্গবিশেষ। দেশ, কালও ভৌগলিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন ধর্মের পূজাপার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য যা তাদের ঐতিহ্যের পরিচয় বহণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবনকালের অধিকাংশ ঘটনা যেহেতু বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে সম্পন্ন হয়েছিল এজন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ উৎসব-অনুষ্ঠানও বিভিন্ন পূর্ণিমা গুলোকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।[১০৭] এছাড়া অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানও রয়েছে যা তারা ধর্মের বিভিন্ন রীতি-নীতির মাধ্যমে পালন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অন্যান্য উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে নববর্ষ। চৈত্র সংক্রান্তি এবং বিষু, বৌদ্ধমেলা ও কল্পতরু উৎসব।

(খ) চাকমাদের পূজা পদ্ধতি

পূর্ণিমোসৎসবসহ বৌদ্ধ ধর্মীয় সকল পূজা সম্পন্ন করা ছাড়াও চাকমারা তাদের নিজস্ব কিছু পূজা সম্পন্ন করে থাকে যার অনেকগুলিই হিন্দু ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কোন কোন পূজার সম্পাদন পদ্ধতি চাকমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধাচে গড়া। দেবদেবীর নামগুলিও হিন্দু ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভূত, প্রেত, দেও, পরী, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদির অস্তিত্বে চাকমারা বিশ্বাস করে এবং রোগ মুক্তি ও জনসাধারণের হিত ও সুখের জন্য এদের পূজা দিয়ে থাকে। যে কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণী বলি দেওয়া বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী হলেও এটা চাকমাদের নিজস্ব কিছু পূজা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।[৯৬ ১০৮]

রাজপুন্যাহ উৎসব

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বৌদ্ধ জন-গোষ্ঠীয় মধ্যে একটি বড় বার্ষিক অনুষ্ঠান হচ্ছে রাজপুন্যাহ উৎসব। জুম কর, ভূমি উন্নয়ন করসহ সরকারী অন্যান্য কর আদায়ের জন্য রাজার পক্ষ থেকে তারিখ নির্ধারণ করে রাজপুন্যাহ উৎসবের আয়োজন করা হয় তিনটি পার্বত্য জেলা শহরে এবং এই মেলা বসে তিন থেকে সাত দিনব্যাপী।[১০৯]

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মেলা সমূহ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নানা স্মৃতিকে স্মরণ রেখে বৌদ্ধ মেলা বসে। যেমন- বৈশাখী পুর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে বিভিন্ন মেলাসমূহ। এসব মেলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করায় মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে এবং উৎসব ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

মৃতসৎকার বিষয়ে বৌদ্ধ রীতিনীতি

বৌদ্ধ সমাজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সমতলীয় বৌদ্ধ ও পাহাড়ী বৌদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, চাকমাদের মধ্যে বুধবারে মৃত ব্যক্তির সৎকার হয় না।[১১১] মৃতদেহ দাহ করার পরদিন হাড় ভাসান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং মৃত্যুর সাতদিন পর হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, সমাজে প্রতিপত্তিশালী লোকের মৃত্যু হলে তাকে নিয়ে চলে রথটানা উৎসব। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মৃত সৎকারের রীতিনীতি সামান্য হেরফের ছাড়া বাঙালী ও পাহাড়ী বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকম।

ভারত বিভাগের সময়ে বৌদ্ধদের অবস্থা

ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের পর ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' ও ১৫ আগস্ট 'ভারত' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে। সেই সাথে জন্ম নেয় সীমানা সংক্রান্ত বিরোধসহ বেশ কিছু সংকটের যা দু'টি দেশের স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, স্থিতিশীলতা, সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক শৃংখলা ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বাঙালী বৌদ্ধ

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। ভারত বিভাগের জন্য ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী বাংলা বিভক্ত হয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পালাবদলের এই ক্রান্তিলগ্নে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দুই দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা দেশান্তরী হতে থাকে। এসময় পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও অন্য কয়েকটি জেলায় অবস্থানরত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করে। এসময় বৌদ্ধরা তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন চট্টগ্রাম শহরের এনায়েতবাজারে বিহারে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, ফনীভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিজ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য এক সম্মেলন আহবান করেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) ও পটুয়াখালী থেকে বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকারের দাবী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৌদ্ধ সমাজের যাবতীয় দাবী দরবার করবার জন্য ও পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য কনফারেন্স এক Standing Committee গঠন করে।[১১৮] এভাবে মুসলমান প্রধান পাকিস্তানে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়

Dhaka University Institutional Repository

ও নতুন সরকারের সাথে সমঝোতা স্থাপন করেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রক্ষা করার পক্ষে বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। ভারত বিভক্তির পূর্বে ২২শে জুনের এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ববঙ্গ আইন সভায় বিশেষ ছাড় দিয়ে দুজন বৌদ্ধ সদস্য গ্রহণ এবং যুক্ত নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ করে অথবা মুসলমানেরা স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করলে বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী দাবী করতে হবে।

আরাকানী বৌদ্ধ

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই বাস করে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। পাহাড়ী বৌদ্ধ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে পাকিস্তান-ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে বৃটিশ-ভারতে চলে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিরা মহকুমা ভারতে অন্তর্ভুক্তির শর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[১১৩] ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিরা মহকুমায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মধ্যবর্তী স্থানে শিখদের ঘনবসতি ছিল। মূল পরিকল্পনা "Bengal Boundary Commission" এর ১৯৪৭ সালের ৮ আগস্ট তারিখের স্কেচ ম্যাপ শিট অনুযায়ী পাঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিরা মহকুমার পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে ভারতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের। পরে বিভিন্ন টানা-হ্যাচড়ার মুখে Major Billy Short- এর সুপারিশক্রমে র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেন ৯ আগস্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফিরোজপুর সদর ও জিরা মহকুমার পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবে।[১১৪]

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানভূক্তির অন্যতম কারণ ছিল কলকাতা বন্দরের উপর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের দাবী। মূলতঃ এই বন্দরটির পশ্চাদভূমি ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং এই বন্দর ও নগর গড়ে তুলতে পূর্ব বাংলার জনগণের সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছিল। উপমহাদেশ বিভক্তির সময় নেহেরু-গান্ধীদের চাপের মুখে ব্রিটিশ বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলকাতার জনসংখ্যা হিন্দু মুসলিম প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পুরো কলিকাতা নগরী ভারতকে দেওয়া হয়। যদিও জনসংখ্যানুপাতে এর কমপক্ষে অর্ধেক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত হবার কথা। বঞ্চিত মুসলমানদের পুরস্কার হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি বিবেচনা করে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত করা হয়।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

তবে এই সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য ছিল "Burrows had explained to me that the whole economic life of the people of Hill Tracts depends upon East Bengal, that there are only one or two indifferent tracts through the jungle in Assam, and it would be disastrous or the people themselves to be cut off from East Bengal. The population consists of less than a quarter of million, nearly all are tribes men, who, if they have any religion at all are Buddhists (and so are technically non-muslim, under the terms of Boundary Commission). In a sense Chittagong, the only port of East Bengal also depends upon the Hill Tracts, for if the jungles of the later were subjected to unrestricted felling, I am told that Chittagong Port would be silt up."[১১৬]

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্যে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অর্ন্তভূক্ত করার স্বপক্ষে দেয়া যুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই সমস্ত জটিলতার কারণেই ১৯৪৭ সালের চৌদ্দ ও পনেরই আগস্ট উপমহাদেশ ভেঙ্গে 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্ত ভূক্তিতে কংগ্রেসের দাবির চেয়ে পাকিস্তানের এই জেলা অন্তর্ভূক্তির জন্য মুসলিম লীগের দাবী ছিল বেশি। মুসলিম লীগের পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছিলেন, তাঁরা পার্বত্য উপজাতির বিশেষ করে সেই স্থানে সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়, চাকমাদের মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। মোগল শাসনের সময় মোগলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চাকমা রাজারা, কোন ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত প্রজারা মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহার করতেন। যদিও তারা কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নি। চাকমা জাতির ইতিহাসে চম্মন খান, জালাল খান, শেরমুস্ত খান, শের দৌলত পাগলা, টব্বর খান, জব্বর খান, ধরম বক্স খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কর্মবিবরণী পাওয়া যায়। মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও তারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[১১৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে ছিলেন তিন রাজা- মং, বোমাং ও চাকমা। তিন সার্কেলের তিন রাজাই স্ব স্ব সার্কেল নিয়ে ছিলেন উদ্বিগ্ন। কোন কোন সময় তা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। অখন্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য তিন সার্কেলের রাজাদের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে ওঠেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি অমুসলিম জনগোষ্ঠীর হওয়া সত্বেও সংকটমোচনের কম-

Dhaka University Institutional Repository

বেশী প্রচেষ্টা হয়েছিল রাঙামাটি কেন্দ্রিক, নয়ত বান্দরবান কেন্দ্রিক, অথবা মানিকছড়ি কেন্দ্রিক। উপমহাদেশ বিভক্তির আগে বৃটিশ, কংগ্রেস মুসলিম লীগের কাছে স্ব স্ব সার্কেলের জন্য দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা (Native State) দাবি করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের তিন শক্তি তাঁদের দাবির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। পরবর্তীতে তাঁরা প্রস্তাব রেখেছিলেন তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া রাজ্যকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে, যা থাকবে কেন্দ্র শাসনাধীনে।[১১৮] এক্ষেত্রেও রাজারা ব্যর্থ হন।

ভারত বিভক্তির আগে চাকমা সার্কেলে ছিলেন তিন ব্যক্তিত্ব। এক, রাজা ভূবন মোহন রায়, দুই জনসমিতির সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান, তিন, জনসমিতির তরুন সাধারণ সম্পাদক স্নেহ কুমার চাকমা। তিন জনের চিন্তার ফারাক ছিল বিস্তর।

> চীফেরা চাহেন রাজতন্ত্র প্রথানুরূপ শাসন পদ্ধতি, জনসমিতির এক পক্ষের লোক (স্নেহ কুমার চাকমার পক্ষীয়) চাহেন জনগণ কর্তৃক শাসন ক্ষমতার অধিকার লাভ, আমি এবং আমার দলীয় লোকেরা চাই, সমাজের নেতা কিংবা রাজা হিসাবে এই পদকে নির্বিঘ্ন ও স্থায়ী করার জন্য এমন এক শাসন নীতি প্রবর্তন আবশ্যক, যাতে চীফ রাজারূপে যিনি থাকিবেন, তিনি সকলের শিরোমণি গণ্য হইয়াও স্বীয় খেয়ালের বশে কিংবা স্বার্থ সুবিধার খাতিরে ইচ্ছা করিলেও যেন প্রজার ক্ষতি ও উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার উপায় না থাকে। ফলে রাজা ভূবন মোহন রায় আরও বেশী রক্ষণশীল হয়ে যান এবং নিজের স্বার্থ যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ভাবে আগলান যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত থাকেন। স্নেহ কুমার চাকমা আরও বেশী উগ্রপন্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান মধ্যপন্থা নিয়ে রাজা ভুবন মোহন রায় ও স্নেহ কুমার চাকমার মাঝে গড়ে ওঠা দেয়াল ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। রাজা ভুবন মোহন রায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যা হয় তাই মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান হাল না ছাড়লেও অনেকটা নিরুৎসাহিত হন। কেউ কিছু করবেনা যখন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে হবে, এমন একটা পরিকল্পনা নেন জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক স্নেহকুমার চাকমা। তিনি গোপন সভা করলেন গ্রামে গ্রামে। পুলিশদের নিয়ে বিদ্রোহ করতে সচেষ্ট হলেন তিনি। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'একজন অফিসার ছাড়া সব পুলিশ ছিল উপজাতি। সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েও ফেলেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণার সাথে সাথে তাঁর দলবল নিয়ে ভারতীয় পতাকা তুলবেন। কামিনী মোহন দেওয়ান এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। পাকিস্তানের ভাগে পড়লে তা মেনে নিতে হবে। বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় সদ্য গঠিত কোন রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতিকে জোর প্রকাশ পূর্বক কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে সম্মত হতে পারে না। তিনি এই রকম হঠকারিতামূলক পদক্ষেপে মারাত্মক ফল ফলবে বলে মত প্রকাশ করেন। স্নেহ কুমার চাকমার একগুঁয়েমী ও ভাবাবেগ প্রাপ্ত উন্মাদনা রোধ করতে পারবেন না জেনে তিনি জনসমিতির সভাপতির পদত্যাগ করেন।[১১৯]

পূর্ব পরিকল্পনা মত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্নেহ কুমার চাকমা তাঁর দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে রাঙামাটিতে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[১২০] পতাকা উড্ডীণ থাকে বিশে আগস্ট পর্যন্ত। জনসমিতি প্রতিরোধ বাহিনীও গঠন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর তুলনায় সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। একুশে আগস্ট পাকিস্তানের বালুচ রেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তোলে।

অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের জনসংখ্যার অধিকাংশ হচ্ছে মারমা। বৃহত্তম বর্মী জনগোষ্ঠীর অংশ যেহেতু মারমারা, তাই তারা চেয়েছিল বার্মার সাথে যুক্ত হতে। পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তিতে বোমাং সার্কেলে, বিশেষ করে রাজপরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। প্রতিবাদ ও বার্মার সাথে একাত্মতা ঘোষণার প্রতীক হিসেবে তাঁরা বান্দরবানে তোলেন বার্মার পতাকা।[১২১] রাঙামাটির মত বান্দরবানেও পাকিস্তানী সৈন্যরা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় পাকাপোক্তভাবে। স্নেহকুমার চাকমা তার দলবল নিয়ে দেশত্যাগী হন। বোমং রাজপরিবারে কিছু সদস্য বার্মাতে আশ্রয় নেন।

সুতরাং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বৌদ্ধরা অভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মতের ও আচরনের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় চট্টগ্রামের সমতল এলাকার বড়ুয়া বৌদ্ধরা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকলেও পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা কী হবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের বৌদ্ধরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়। ফলে রাঙামাটিতে চাকমা বৌদ্ধরা উত্তোলন করে ভারতের পতাকা, আর বান্দরবানে মারমা বৌদ্ধরা উত্তোলন করে বার্মার পতাকা। পরবর্তীতে কোন রকম সহিংস ঘটনা ছাড়াই পাকিস্তান সরকার এ দুই অঞ্চল থেকে দুই দেশের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ধর্ম রয়েছে যা তারা জাতিগত ভাবে পালন করে থাকে। ধর্মীয় দিক থেকে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সামাজিক রীতি-নীতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান রয়েছে যা পাহাড়ী বৌদ্ধ ও বাঙালী বৌদ্ধ সকলেই সমভাবে পালন করে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুর্ণিমাকেন্দ্রিক উৎসব অনুষ্ঠান এবং কঠিন চীবর দানোৎসব। তবে সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে বাঙালী বৌদ্ধ ও পাহাড়ী বৌদ্ধদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন, বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির ক্ষেত্রে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু পাহাড়ী বৌদ্ধ সমাজের কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধ আদর্শের পরিপন্থী। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমাবনতির যুগে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুদের তান্ত্রিক মতবাদের সাথে হিন্দুদের বহু দেবদেবী ও আচার-আচরণ এই ধর্মে অনুপ্রবেশ করে। যেমন- কিছু কিছু পূজায় পশুপাখি বলি দেওয়ার বিধান ও হিন্দু মন্ত্রোচ্চারণ- বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী হলেও পাহাড়ী বৌদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্য। মদ্য গ্রহণ এদের জাতীয় জীবনের সাথে জড়িত। বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ বাস করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বেশীর ভাগই আবার ধর্মীয় দিক থেকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী। বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার সাংখ্যতাত্ত্বিক হিসাব থেকে এ বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। চট্টগ্রামের সমতল এলাকায় বড়ুয়া বৌদ্ধদের বসবাস রয়েছে যারা বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শরীক হয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের জনগণ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-বিক্ষোভ করেছে এবং বাংলার সমতল এলাকার বাঙালী বৌদ্ধরা তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের আরাকানী বৌদ্ধদের ভূমিকা সে তুলনায় খুবই কম। পার্বত্যাঞ্চলের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এখানকার বৌদ্ধরা ব্যস্ত থেকেছে। ফলে ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভক্ত হয় তখন এ অঞ্চলের বৌদ্ধদের একাংশ ভারতের পক্ষে এবং অন্য একটি অংশ বার্মার সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে।

=====O=====

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১. A.L. Basham, *The Wonder that was India*, Delhi, 1987, p. 258.

২. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা ঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, পৃ-১০৩, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, ঢাকা।

৩. Dr. Dilip Kumar Barua & Dr. Mitsuru Ando, *Syncretism in Bangladeshi Buddhism*, Japan, 2002, p-12

৪. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৬

৫. ড. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৮০ বাংলা, পৃঃ- ৭।

৬. যতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৩২২ (বাংলা), পৃ-২০,

৭. *Indian Historical Quarterly*, Vol- X, 1934. p. 58, নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান, ময়নামতি*, পাহাড়পুর, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ-১২।

৮. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৮৯ বাংলা, পৃঃ-৩১।

৯. *Indian Historical Quaterty*, Vol- VII, 1932, p. 65.

১০. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*, কলকাতা, ১৩৬৬ বাংলা, পৃঃ-১৬০।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ১৬০-৬১।

১২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৫৬ বাংলা, পৃঃ-৪৪৬।

১৩. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-১৬১।

১৪. A. H Dani, *Buddhist Sculpture in East Pakistan*, Government of Pakistan, Karachi, 1959, p.20.

১৫. শহীদুল্লাহ মৃধা, *মহাস্থবির শীলভদ্র*, ঢাকা, ১৯৭৭ ইং, পৃঃ-৮৫।

১৬. ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৬২।

১৭. R. C Majumdar (ed), *History of Bengal*, Vol-1, Dhaka, 1943, p. 30.

১৮. Thomas Watter, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol-II, London, 1905, p.335, 184.

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৭, ১৯০।

২০. নাজিমুদ্দিন আহম্মেদ, *মহাস্থান, ময়নামতি*, পাহাড়পুর, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ-১৪।

২১. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৪৫

২২. *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol-1, 1905-07, No-6, p. 89-91.

২৩. R.C Majumdar, *op cit*, p. 86.

Dhaka University Institutional Repository

২৪. N.K Bhattashali- *Iconography of Buddhist And Brahmanical Sculpture in Dacca Museum*, Dacca, 1972, p. 6-7, R.C Majumdar- op. cit, p. 17.

২৫. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ৪৯৬।

২৬. R.C Majumdar, op. cit, p. 194.

২৭. N.K Bhattashali op. cit, p. 11.

২৮. নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*, কলকাতা, ১৩৫৫ (বাংলা), পৃঃ- ২১৩-১৪।

২৯. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, Dhaka, 1967, pp. 272-273.

৩০. F. Kielhorn, Khalimpur Inscription, *Epigraphia of India*, Vol. IV. p. 243.

৩১. Samuel Beal: *Buddhist Records of the Western World*, Delhi, 1995 (Reprint), Vol- II, p. 408.

৩২. প্রণব কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য, *কৃষ্টি*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৭।

৩৩. R. C Majumdar, *History of Bengal*, vol-2, Dhaka, 1943, p. 426.

৩৪. ড. বি, এম বড়ুয়া, প্রবন্ধঃ পাল যুগে বৌদ্ধ বিহার, *জগজ্জ্যোতি*, কলিকাতা, ১৯৩২।

৩৫. R. C Majumdar, op cit, p. 115.

৩৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ-৪৭।

৩৭. Dipak Kumar Barua, *Vihars in Ancient India*, Calclutta, 1969, p. 177.

৩৮. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ-১৬৫।

৩৯. Dipak Kumar Barua, op cit, p. 45.

৪০. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-১৬৫।

৪১. Dipak Kumar Barua, op cit, p. 45.

৪২. *প্রাগুক্ত*, 1969, p. 180.

৪৩. S.N.H. Rizvi (ed), *Bangladesh District Gazetteer, Chittagong*, 1975, p. 60.

৪৪. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ৪৯৬।

৪৫. R.C Majumdar, op. cit, vol-2, pp-332-336.

৪৬. ড. সুকোমল বড়ুয়া (সম্পাদনা), *দীপঙ্কর*, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ঢাকা-২০০০, পৃঃ-১৬।

৪৭. রাসমোহন চক্রবর্তী, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, *স্মরনিকা*, ঢাকা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২৫১২, বুদ্ধাব্দ, ১৯৬৮, পৃঃ- ৪৫-৪৬।

৪৮. A.K.M Shamsul Alam, *Sculpture Art of Bangladesh*, Dhaka, 1985, p. 35.

৪৯. R.C Majumdar, op. cit, p. vol-2, 418.

৫০. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃঃ-৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. R.C Majumdar, op. cit, Vol-2, p. 425.

৫২. Sukumar Datta, *Buddhist Monk & Monasteries of India*, London, 1935, p. 358.

৫৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড প্রাচীন যুগ, কলকাতা, ১৩৭৩ (বাংলা), পৃঃ-১৬৩।

৫৪. ধর্মাধার মহাস্থবির, চট্টলে মগধ সংস্কৃতি, বুদ্ধজয়ন্তী স্মরণিকা, মহেশতলা বৌদ্ধ সমিতি, কলিকাতা, ১৯৭৯।

৫৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ১৬৪।

৫৬. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৮০ (বাংলা), পৃঃ-২৯।

৫৭. বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, *চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস*, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৬, পৃঃ ২৩১।

৫৮. Abdul Mabud Khan, *The Maghs : A Buddist Community in Bangladesh, UPL, 1999*, pp. 48,115.

৫৯. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh National Archieves*, Dhaka, Bundle-69, January 1953, Proceedings No- 1455-66.

৬০. আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৮ ও ৫৪।

৬১. আহমদ শরীফ, *কালের দর্পনে স্বদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ-১১।

৬২. কুমিল্লা জেলা পরিষদ, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, ধর্ম ও ধ্যান ধারণা- এক, বৌদ্ধ ধর্ম, পৃঃ ২০৯।

৬৩. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *পালোত্তর যুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়* (অপ্রকাশিত পি, এইচ ডি, থিসিস), কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ-২২৬-২৭।

৬৪. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *বড়ুয়া জাতির ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৬, পৃঃ-৩৫।

৬৫. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol. 6, London, 1876, p. 143.

৬৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৩৭৩ (বাংলা)।

৬৭. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫*, কলিকাতা, ২০০১, পৃঃ-৮৭৭।

৬৮. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ- ১৫৯।

৬৯. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃঃ-৭।

৭০. নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ-১৫০।

৭১. নীরুকুমার চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-১৫০।

৭২. Abdul Mabud Khan, op. cit. p- 37.

৭৩. *প্রাগুক্ত*, p- 39.

৭৪. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিকথা, *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, রাঙ্গামাটি, ১৯৮২, পৃঃ- ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. Abdul Mabud Khan, op. cit p. 40.

৭৬. ড. আহমেদ শরীফ, *কালের দর্পনে স্বদেশ, ঢাকা*, ১৯৮৫, পৃঃ-১১১।

৭৭. অরুণ বিকাশ বড়ুয়া,চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ পরিচিতি, *অনোমা*, বার্ষিক সংকলন-১৫, ১৯৯১।

৭৮. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৫,

৭৯. অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ পরিচিতি, *প্রাগুক্ত*।

৮০. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবংশের ইতিহাস, *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, পৃঃ-৩৬। R. H. S. Hutchinson, *Chittagong Hill Tracts*, Delhi, 1978, p. 24-25.

৮১. R. H. S. Hutchinson, op. cit, p. 25.

৮২. Abdul Mabud Khan, op. cit p- 46.

৮৩. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮।

৮৪. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol. 5, London, 1875, p. 88.

৮৫. *Government of Bangladesh: Banaladesh District Gazetteers: Patuakhali*, B.G. Press, Dhaka-1982, p. 59.

৮৬. Abdul Mabud Khan, op. cit p- 43.

৮৭. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবংশের ইতিহাস, প্রবন্ধ, *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২০০।

৮৮. A Mabud Khan, op. cit, p. 48.

৮৯. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ২০২।

৯০. *প্রাগুক্ত*।

৯১. P. Babassignet, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, ঢাকা, পৃঃ- ৯।

৯২. অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, *চট্টগ্রামের বড়ুয়া*, বড়ুয়া পরিচিতি। অনোমা, প্রাগুক্ত।

৯৩. আবদুল হক চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা উপজাতি, প্রবন্ধ, *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, পৃঃ ১৭৫।

৯৪. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ২০৯।

৯৫. বিরাজমোহন দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, রাঙামাটি, ১৯৬৯, সারোজ আর্ট প্রেস, পৃঃ- ২০২।

৯৬. *Census of India, 1921*, Report by W.H. Thompson, Vol-V, Bengal part-1, Calcutta, 1923, page-156.

৯৭. *Census of Pakistan Population 1961*, Tables & Report by H. H. Nomani, S. K. p. II-15, Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

৯৮. সুকোমল চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩।

৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৮৪

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১০১. বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, রাঙামাটি, ১৯৯৮, পৃঃ- ৯৪।

১০২. মুস্তাফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ-৮১

১০৩. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-৩১, ৪৮।

১০৪. বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০।

১০৫. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার*, ঢাকা, ২০০০, পৃ-৩৬

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩০.

১০৭. সুকোমল চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৪।

১০৮. বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭, ২৮।

১০৯. শিমুল বড়ুয়া, বাংলাদেশের বাঙ্গালী ও উপজাতীয় বৌদ্ধ উৎসব, অনোমা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৯, পৃ-১০৫।

১১০. *প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০৬।*

১১১. বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।

১১২. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, *বেনী মাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতা মালা*, ২০০১, চট্টগ্রাম।

১১৩. S. Mahmud Ali, *The Fearfull State*, p. 176.

১১৪. Chittagong Hill Tracts Commission: *Life is not ours, Land and Human Rights in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission*, May 1994, p. 30.

১১৫. *প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০।*

১১৬. Larry Collins and Dominiq la Pierre, *Mountbatten and the Partition of India*, Delhi, 1982, p. 178.

১১৭. বিরাজ মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ১৫৩।

১১৮. Aggabangsha Mahathera, *Stop Jenocide In Chittagong Hill Tracts*, Calcutta, 1981, P-3.

১১৯. কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃঃ ২৪৯-৫০।

১২০. *Life is not ours*, op. cit, P. 122.

১২১. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

ভূমিকা

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনে থাকার পর ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হওয়াতে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্যরা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। এসময় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে স্বীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা বিভিন্ন সংগঠনও গড়ে তোলে। পাশাপাশি তারা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার দাবী জানায় এবং যুক্ত নির্বাচনে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচনের দাবী করে। এই সময়কালে ধীরে ধীরে তারা প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের আসনেও নির্বাচিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বৌদ্ধদের অবস্থা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারত বিভক্তির ফরমূলায় পাকিস্তান সৃষ্টি ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আলাপ-আলোচনা করে। পূর্ব-বাংলার প্রত্যন্ত চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্য কয়েকটি জেলায় অবস্থানরত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত নিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'ভারতীয় ইউনিয়ন' ও 'পাকিস্তান'। পাকিস্তান সৃষ্টি হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে। ভারত বিভাগের জন্য ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী বাংলা বিভক্ত হয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এসময়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে দুই দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা দেশান্তরী হতে থাকে। পূর্ব বাংলা থেকে ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে বৌদ্ধরাও অস্থির হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, পূর্ব পুরুষদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে দেশান্তরী হওয়া অনগ্রসর বৌদ্ধদের জন্য সমীচীন নয় এবং মুসলমান প্রধান পাকিস্তানে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ও নতুন সরকারে সাথে সমঝোতা স্থাপন করেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব রক্ষা করার সম্ভব। ফলে প্রখর রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধসম্পন্ন দূরদর্শী বৌদ্ধ নেতা ফণীভূষণ বড়ুয়া পরিবর্তনীয় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের শীর্ষ নেতাদের সাথে দ্রুত আলোচনা করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নবসৃষ্ট পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন।[১]

১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বৌদ্ধদের ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন চট্টগ্রাম শহরে এনায়েত বাজারে অবস্থিত বিহারে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী, ফণীভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য এক সম্মেলন আহবান করেন। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) ও পটুয়াখালী থেকে বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ নেতা এবং প্রায় সমুদয় উচ্চশিক্ষিত বৌদ্ধ সকলে একবাক্যে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে বৌদ্ধ সম্পদায়ের ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকারের দাবী এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৌদ্ধ সমাজের যাবতীয় দাবী দরবার করার জন্য ও পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে কনফারেন্স এক Standing Committe গঠন করে। এছাড়া ১৯৪৭- পরবর্তী স্বাধীন পাকিস্তানে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ববঙ্গ আইনসভায় আসন সংরক্ষণ করে দুজন বৌদ্ধ সদস্য গ্রহণ এবং যুক্তপ্রথা নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ অথবা মুসলমানেরা স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করলে বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা মঞ্জুর করার জন্য দাবী করতে হবে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ১৯৪৮ সালে ও ১৯৫০ সালে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এ সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক লোক দেশ ত্যাগ করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও বার্মায় পাড়ি জমায়। আবার অনেক মুসলমান ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। এরকম সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাঙালী বৌদ্ধরাও এদেশ ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা নিজেদেরকে এদেশের 'ভূমিজ সন্তান' বলে ঘোষণা করে। তবে বৃটিশ শাসনামলে কলকাতা নগরী আধুনিক জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে ওঠায় অনেক বাঙ্গালী মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগন উন্নত জীবনযাপনের আশায় ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেও কলকাতায় স্থায়ীভাবে থেকে যান। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পাহাড়ী তথা আরাকানী বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। বিপুল সংখ্যক আরাকানী বৌদ্ধ এ সময় দাঙ্গা ও অন্যান্য কারণে তাদের অবস্থান ত্যাগ করে আরাকান ও বার্মায় চলে যায়। নিম্নে এসময়কার আরাকানী বৌদ্ধদের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো ঃ

সারণী-১৩
পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতির জনসংখ্যা

বৎসর	মোট জনসংখ্যা
১৮৭২	৪,০৪৯
১৯১১	৮,৬০০
১৯৫১	১৬,৩৯৪
১৯৬১	১২,১৯০

সূত্র ঃ মুস্তাফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৯২।

১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং এর জের চলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পূর্ব পাকিস্তানে। ভারতের বিহার রাজ্যে প্রথম দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পরিবার গৃহহারা হয়। একদিকে লক্ষাধিক বিহারী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকেও বহুসংখ্যক হিন্দু ভারতে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করা বিহারী উদ্বাস্তুদের একটি অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।[৩] সরকার খাস জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেয়। খাস জমি বলতে পার্বত্য অঞ্চলে বেশির ভাগ ছিল আবাদ অযোগ্য পাহাড়। সে ক্ষেত্রে পাহাড় চষে ফসল ফলানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং এজন্য বিহারী উদ্বাস্তুরা কষ্টের পথে না গিয়ে উপজাতিদের তৈরী করা জমি দখল করা শুরু করে। ফলে স্থানীয় আরাকানী বৌদ্ধদের অনেকেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এসময় পটুয়াখালী ও অন্যান্য সমতল এলাকা থেকে আরাকানী বৌদ্ধদের একাংশ স্বীয় বাস্তুভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এছাড়া ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সরকারী সফরে চীনে যান এবং তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী। ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কিছু কাজ করেন তার মধ্যে একটি হলো আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বহির্ভূত এলাকা (এক্সক্লুডেড এরিয়া)-র মর্যাদা তুলে দেওয়া। এর ফলে কয়েক হাজার বাঙালী পরিবার দু'দিনেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে উপজাতিদের জমি দখল করে উপজাতিদেরই ঘরছাড়া করে।[৪]

পাকিস্তান গণপরিষদের মৌলিক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

স্বাধীনতাত্তোরকালে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সরকার কর্তৃক গণপরিষদের মৌলিক নাগরিক অধিকারসহ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে বৌদ্ধনেতা হিসেবে আইনজীবি ফনীভূষণ বড়ুয়া সদস্য মনোনীত হন। পাকিস্তানে আরো যেসব শীর্ষে রাজনীতিবিদেরা এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, খাজা সাহাবুদ্দিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান, মন্ত্রী সর্দার আবদুর রব, মন্ত্রী এম এ খুরো, মন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল, মন্ত্রী ফজলুর রহমান, মন্ত্রী গজনফর আলী খান, সর্দার বাহাদুর খান, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রেমহরি বর্মন, ভীমলেন সাচার, সি ই গিবন (খ্রিস্টান নেতা) ও জামসেদ নুসেরওয়ানজী মেহতা (পার্সী নেতা)।[৫] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এর হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পার্সি সম্প্রদায়ের নেতারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নতুন রাষ্ট্রের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নীতিনির্ধারণী প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "এখন থেকে পাকিস্তানে মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

আর মুসলমান বলে পরিচিত হবে না, হিন্দু হিন্দু নামে পরিচিত হবে না, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পার্সী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা স্ব স্ব ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হবে না- সকলে মিলে এক অভিন্ন পাকিস্তানী জাতি গঠন করবে।"[৫৬] অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলমান- দুটি জাতি এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হয়েও জিন্নাহ তার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাবনা দ্বারা নতুন দেশের সংহতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা ফণীভূষণ বড়ুয়া স্বাধীন পাকিস্তানের নতুন নীতি ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবণ করে জিন্নাহর নীতিনির্ধারণী বক্তৃতার আলোকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন।

নাগরিক অধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ কমিটি সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রে ও প্রদেশ সমূহে তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধিকার সম্বলিত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। এসব বিষয় নিয়ে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের স্বার্থে আলাপ-আলোচনা করে ফণীভূষণ বড়ুয়া বৌদ্ধদের মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে তাঁর রিপোর্ট গণপরিষদে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে তখনকার রাজধানী করাচীতে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে তাঁর অবহিত করেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থান ও দাবী সমূহ।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী

পাকিস্তান গণপরিষদের নাগরিক অধিকার ও সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ বিষয়ক কমিটিতে দেশের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর একটি সুপারিশে দেশের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার বিধি সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা পৃথক নির্বাচনের বিরোধীতা করে অভিমত দেন এই যুক্তিতে যে এতে সংখ্যালঘুরা অনিশ্চয়তা ও হীনমন্যতার শিকার হবে। তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ সহ যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানান। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সি. ই. গিবন এবং বৌদ্ধদের প্রতিনিধি ফণীভূষণ বড়ুয়া হিন্দুদের প্রদত্ত অভিমতের সাথে একমত পোষণ করেননি। কারণ সেসময় বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প এবং এই অল্প সংখ্যক বৌদ্ধদের প্রদত্ত ভোটে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। ফলে আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে দূরদৃষ্টি নিয়ে ভূমিকা রাখেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে সদস্য হন।[৭]

বৌদ্ধ জনপদ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসননীতি

ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনিক ভাবেই ছিল চট্টগ্রাম জেলার একটা অংশ। ১৭৭৭ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানী এই পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল দখল করে। ১৭৮২ সাল পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চল শাসন করতেন চাকমা ও বোমাং রাজা। ১৭৮৭ সালে এক চুক্তি বলে এই অঞ্চলে বৃটিশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।[৮] ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ ভারতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সর্বপ্রথম রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনকে নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামে নতুন একটা জেলা সৃষ্টি করা হয়। জেলার শাসনকর্তার পদবী ছিল সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং নবগঠিত জেলার সদর দপ্তর ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে চন্দ্রঘোনায়।

১৮৬৭ সালে শাসনকর্তার পদবী পরিবর্তন করে ডেপুটি কমিশনার করা হয় এবং সদর দপ্তর রাঙামাটিতে স্থানান্তর করা হয়। পরে ১৮৯১ সালে একজন সহকারী কমিশনারের শাসনাধীনে একে একটা স্বতন্ত্র মহকুমায় পরিণত করা হয়। ১৯০০ সালের মে মাসে Chittagong Hill Tracts Regulation' (Regulation No. 1 of 1900) নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় নতুন আইন প্রবর্তন করা হয় এবং এতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সরকার নন- রেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দেয়।[৯] এই রেগুলেশন বলে রাজাদের প্রভাব, মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এর পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম' 'বহির্ভূত এলাকা' (Excluded area) হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার জেলায় উন্নীত করে শাসনকর্তার পদবী পুণরায় সুপারিনটেন্ডেন্ট করা হয়। পাশাপাশি বাংলার সরকার একটি জেলা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে পার্বত্য তিন রাজাকে নিয়ে।[১০] এ সময় ব্রিটিশ-ভারত সরকার ৫,০৯৫ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিন রাজার অধীনে তিনটি সার্কেলে ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

করে দেয়- চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল। প্রতিটি সার্কেল একজন প্রধান বা রাজার নিয়ন্ত্রণে দেয়। তিনটি সার্কেল ৩৬৫ টি মৌজা নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি মৌজা দেখাশুনা করার জন্য একজন হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজা গঠিত এবং প্রতিটি গ্রাম আবার একজন কার্বারী বা গ্রামপ্রধান -এর প্রশাসনাধীনে দেওয়া হয়। প্রশাসনের সার্বিক দায়দায়িত্ব দেয়া হয় সুপারিনটেনডেন্ট- এর হাতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন ব্রিটিশদের হতে যাবার আগে এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার ও শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল রাজাদের হাতে।[১১] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকা- এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। ১৯০০ সালের রেগুলেশন প্রথম সংশোধন করা হয় ১৯২০ সালে এবং পরে ১৯২৫ সালে। উভয় সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নতুন নীতি সংযোজিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত শাসিত হয় ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী।

পাকিস্তানী শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ

স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি অস্থির হয়ে উঠে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত- 'রাজ্যগুলো' (স্টেটস্) শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে কেন্দ্র বনাম প্রদেশগুলির লড়াই শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দেয়ার জোর দাবি ওঠে। ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে শুরু হয় পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের দাবী। সে সময়ে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ-র মৃত্যু হয়। দুই বৎসর পর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচিত হয় এবং আইন পরিষদের নেতা হন কৃষক- প্রজা পার্টির প্রধান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলবৎ রাখে। এ রেগুলেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কিছুটা স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছিল। বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য উপজাতিদের থেকে রিক্রুট করে একটি আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল এবং এ বাহিনীর আলাদা নিয়মকানুন ছিল।[১২] এতে জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতিদের অংশগ্রহণের একটা সুযোগ ছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন উঠিয়ে দেয় এবং বিলুপ্ত হয় বিশেষ বাহিনী।

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত ১৯৫৬ সালে। এই শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় আসেন মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা এবং পরে তাঁকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তগত করেন। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ও সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৬০ সালে পূর্বের উপদেষ্টা পরিষদ রহিত করে গঠন করা হয় জেলা পরিষদ।[১৩] এ সময় পাকিস্তানে শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার কাজ শুরু হয়। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এই প্রকল্পের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শত শত একর আবাদী জমি জলমগ্ন এবং হাজার হাজার লোক চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়। সরকার পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস দিলেও তা করা হয় নামে মাত্র। অন্যদিকে কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত চাকমা জনগণের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এদের জীবনে বিভিন্ন উন্নয়ন সাধিত হয়।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র রচনা করেন আইয়ুব খান। এই শাসনতন্ত্রের পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিশেষ এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং 'বহির্ভূত এলাকা' শব্দটি তুলে দিয়ে সেখানে বসানো হয় উপজাতীয় এলাকা। ১৯৬৬ সালে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বলা হয়, পুরো কিংবা আংশিকভাবে কোন উপজাতি এলাকার বিশেষ ব্যবস্থা যদি বিলোপের প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে উক্ত এলাকার জনসাধারণের মতামত নেবেন।[১৪] কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সঙ্গে কোন প্রকার মতমত বিনিময় না করে উপজাতি এলাকা হিসেবে জেলার বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দেবার বিল জাতীয় পরিষদে পাশ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান 'উন্নয়নের দশক' বা ক্ষমতায় থাকার দশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেন। এ সময় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১১ দফা দাবী প্রনয়ন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ছাত্ররাও (বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের) আইয়ুব বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে যোগ দেয়। অবশেষে এক গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানকে সরিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা করেন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়ী হয় আওয়ামি লিগ। পাকিস্তানে ছিল তখন তিন শক্তি- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টি, আর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী।[১৫] নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের অখন্ডতা রুখতে গিয়ে রাস্তায় সেনাবাহিনী নামিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার পথ পরিস্কার করে ইয়াহিয়া খান। অতঃপর ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর দ্বি-জাতি তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে।

পাকিস্তানে নির্বাচন এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বৌদ্ধ সদস্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে অমুসলিমদের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত হয় এবং এর মধ্যে দু'টি আসন ছিল বৌদ্ধদের জন্য। এটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন এবং এ নির্বাচনে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনে বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান। উল্লেখ্য যে উক্ত নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ২২৩টি আসন। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে যুক্তফ্রন্ট সমর্থনে ১০ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং এতে যুক্তফ্রন্টের মোট আসন দাঁড়িয়েছিল ২৩৩টি (২২৩+১০)।[১৬]

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে ক্ষমতার হানাহানির মাঝে পাকিস্তানের রাজনীতির উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল পূর্ব বাংলার 'যুক্ত নির্বাচন প্রথা' চালু। ১৯০৮ সালে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভাগ করে রাখার উদ্দেশ্য চালুকৃত পৃথক প্রথা নির্বাচনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে যুক্তপ্রথা নির্বাচন বাঙালীদের সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ এনে দেয়। যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ একাই। তখন ন্যাপ ছিল আওয়ামী লীগের ভিতরে এবং বিপক্ষে ছিল মুসলিম লীগ, কে, এস, পি নেজামে ইসলামী, জামাত, তমুদ্দুন মজলিস।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রের অধীনে পাকিস্তানে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আইনসভার কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের মার্চে আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। উক্ত সংবিধানে প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৯৬২ সালের নির্বাচন

১৯৬২ সালে এপ্রিল মাসের জাতীয় পরিষদের এবং মে-তে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলার একটা অংশের সাথে জুড়ে দিয়ে একটা আসন বরাদ্দ করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়, চট্টগ্রাম ১০ নং আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১৭]

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম আসনে চট্টগ্রাম জেলা থেকে জনাব গিয়াস উদ্দীন আহম্মদ নির্বাচিত হন এবং তিনি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১০ আসনে বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী সদস্য নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনের পর পরই তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর শূন্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক আসন বরাদ্দ করা হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে চাকমা রাজা রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দু'টি আসন বরাদ্দ করা হয়। নির্বাচনে একটি আসনে রাঙামাটি থেকে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা এবং অপর আসনে বান্দরবান থেকে অং শৈ প্রু চৌধুরী উভয়েই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা সামগ্রিকভাবে স্বীয় এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্যও কাজ করেছেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদয়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

পাকিস্তান গণপরিষদে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ নীতির ফলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলীয় জেলাসমূহের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা চালু, কারিগরী মহাবিদ্যালয় যেমন মেডিকেল কলেজ, ইনজিনিয়ারিং কলেজে পার্বত্য বৌদ্ধসহ মেধাবী বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত বৌদ্ধ প্রার্থীদের জন্য বিশেষ বিবেচনা দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ফনিভূষণ বড়ুয়ার একটি প্রস্তাব সম্বলিত চিঠির অংশ বিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

> "I can assure you that there are fittest candidates of our community serving as Upper Division Clerks in Govt. Offices. If you like to enlighten yourself about the Buddhist of East Pakistan please refer to Mr. N. M. Khan, the Addl. Chief Secretary who is in the know of all things about the Buddhists of East Pakistan."[১৯]

বিভিন্ন চাকুরীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের বিশেষ বিবেচনার জন্য সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার প্রস্তাব সম্বলিত আর একটি চিঠির অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

> "That during the period of provincial Autonomy, however, the cases of the Buddhists were considered along with those of the caste Hindus who being far more advanced than the Buddhists educationally and culturally, the Buddhist candidates could not successfully compete

Dhaka University Institutional Repository

with the Hindu candidates with the result that they failed to secure adequate representation in the different services under Government.

That it is quite appaling to note that during the long twelve years of provincial autonomy in the then joint Bengal the Buddhists could not secure more than one post in the Gazetted rank- that of a Head Master of Govt. High schools in the whole Education Department. Although there were no dearth of qualified candidates from among the Buddhists- all other cadres viz- the senior services like the Divisional Inspectors of schools, Principals and Vice Principals of Govt. Colleges and other posts in the Educational Directorate, the Provincial posts of professors, District Inspectors of Schools, Superintendent of normal schools and the like having been left absolutely unrepresented.

Now that we have been able to shake off the foreign yoke and have won the Independent Soverign state of Pakistan it is only meet and proper that the Buddhists should as a distinct community be awarded their legitimate share of service in all Department of Govt. and specially in the Education Department in E.P.E.S. as Head Masters of Govt. Schools, Superintendent of Normal Schools, and District Inspectors."[২৩]

এছাড়া পঞ্চাশ দশকব্যাপি বৌদ্ধ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী কলেজসমূহে আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি পদক্ষেপের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধদের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রেডিওতে প্রথম বুদ্ধবাণী পাঠ করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে বৌদ্ধদের অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ১৯৫১ সালে গবর্ণর ফিরোজ খান নুন এবং মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মাধ্যমে ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য প্রথম দাবী পেশ করা হয় এবং সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয় পালি

Dhaka University Institutional Repository

ও সংস্কৃত বোর্ড গঠনের জন্য। বৌদ্ধদের জন্য আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবীও পেশ করা হয় একই বছরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলার জন্য দাবী পেশ করা হয় ১৯৫৪ সালে।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধদের স্বীকৃতি দান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রথমবারের মত পবিত্রমত দিবস হিসেবে বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের এই দাবীটি ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে সরকারের নিকট উত্থাপন করেছে। এই দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় এবং এর কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

> "That the Bengal Provincial Buddhist Association feels satisfaction that the Buddha Purnima Day is now-a-days widely and enthusiastically observed as a very sacred day by the people at large in Bengal in honour of the sacred memory of Lord Buddha who was undoubtedly a great world figure and master-mind, and who proclaimed from the soil of India the lofty and noble messages which the modern disordered world is beginning to appreciate and welcome as sure way to peace, progress and happiness, and resolves that the two Governments of West Bengal and East Bengal be earnestly requested to declare a public holiday for one day only every year on account of the Buddha Purnima Day Which in itself is an unique and Thrice-Blessed Day as it commemorates the three remarkable events in the life of Lord Buddha, namely, his Birth, Enlightenment and Demise, and whose figures and a notable date in Indian History." [২১]

১৯৫৬ সাল থেকে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় দুই বৎসর পর পর বিদেশে বৌদ্ধ উৎসব উপলক্ষে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। এছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আরও অন্যান্য দাবী বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করা হয় এবং সরকার বিভিন্ন সময়ে তা পূরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এদেশে তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্নভাবে অগ্রসর হয়। প্রথমেই তারা তাদের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য নবসৃষ্ট পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে। বিভিন্ন পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোক দেশত্যাগ করলেও বৌদ্ধরা এ দেশেই থেকে যায় এবং তারা নিজেদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিজ সন্তান বলে ঘোষণা করে। পাকিস্তান গণপরিষদে মৌলিক নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠিত হলে সে কমিটির মাধ্যমে তারা তাদের বিভিন্ন দাবী সরকারের নিকট উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে বৌদ্ধরা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং তাদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেশের শাসন ব্যবস্থায়ও অংশগ্রহণ করে।

=== O ===

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. অনোমা সাংস্কৃতিক *গোষ্ঠী, বেণীমাধব ও ফনীভূষণ স্মারক বক্তৃতা মালা*, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০১, পৃঃ ৩৩।

২. *প্রাগুক্ত।*

৩. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৩২ বাংলা পৃ ঃ ৬৮।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৬৯।

৫. *Government Report of the Committee on fundamental rights of Citizens of Pakistan and on matters relating to minorities:* Constituent Assembly of Pakistan-22nd December. 1952.

৬. অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, *বেণীমাধব ও ফনীভূষণ স্মারক বক্তৃতা মালা*, চট্টগ্রাম ডিসেম্বর ২০০১, পৃ ঃ ৩৪।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৩৫।

৮. Janasanghati Samiti, *An Account of Chittagong Hill Tracts,* 14th July, 1982, P-2, AggaBang.ia Mahathera, *Stop Genoside in Chittagong Hill Tracts,* Calcutta, 1981, P-2.

৯. *Bengal Government Notification No. 123,* P.P., 1st May, 1900.

Dhaka University Institutional Repository

১০. *Bangladesh District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts,* 1971, P-29 32.

১১. T. H. Lewin, *A Fly on the Wheel,* London, 1912, P-206-207.

১২. *Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation, 1881, Bengal Government Circulation,* 7th December, 1881.

১৩. Bangladesh District Gazetter, *Chittagong Hill Tracts,* 1975, P-96.

১৪. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ১৯৬২।

১৫. Zulfikar Ali Bhutta, *If I am Assassinated*, Delhi, 1979, P-116.

১৬. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, পৃঃ ৮-৯, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

১৭. *Proceedings of East Pakistan Provincial Assembly, First session, 1962.*

১৮. *Assembly Proceedings, East Pakistan Provincial Assembly, Budget session, 1965-66.*

১৯. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political,* Bundle- 83, Sep, 1953 Proceeding No.. 237, Bangladesh National Archieves, Dhaka.

২০. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political,* Bundle-138 May, 1957, Proceeding No.- 225, Bangladesh National Archieves, Dhaka,

২১. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political,* Bundle-138 May, 1957, Proceeding No.- 292-93, Bangladesh National Archieves.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৭১ সাল-পূর্ব বৌদ্ধ সংগঠনসমূহ

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বা ধর্মীয় সংগঠন অথবা যে কোন দলীয় কর্মকান্ড ছিল খুবই সীমিত এবং বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ। ধর্মীয় সভা করতে হলেও পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হতো।[১] এরূপ অবস্থায় চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্য গঠিত হয়েছে যে সব সমিতি ও সংস্থা সেগুলো হচ্ছে- চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমাগম, চট্টল ভিক্ষুসংঘ, রামধন স্মৃতি ভান্ডার, সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা প্রভৃতি এবং ভারত বিভাগের পর গঠিত হয়েছে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ প্রভৃতি। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত ও সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ত সর্দার বা রাজাদের অবলম্বন করে ঘুরত তাদের জীবন প্রবাহ। রাজারা ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। রাজাদের নিজস্ব স্বার্থে তৈরি কাঠামো ছাড়া সেখানে সুসংগঠিত দল বা সংগঠন ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছিল এবং এ তিন সার্কেলের তিন রাজাও সম্ভবত চাইতেন না জনগণ রাজনীতি সচেতন হোক। কেননা জনগণ রাজনীতি সচেতন হলে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকবে না। এছাড়া সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছনে আর ও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে প্রথমত, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অশিক্ষা, দ্বিতীয়ত, রাজাদের নিজেদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার ভয়, তৃতীয়ত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক প্রশাসন, চতুর্থত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তথা নেতৃত্বের অভাব। পঞ্চমত, দল বা সংগঠন সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের ভীতি। কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে থাকে।[২]

পাহাড়ী বৌদ্ধদের সংগঠন সমূহ

ভারত বিভাগ-পূর্ব সংগঠন সমূহ

পাহাড়ীদের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দু'একজন এগিয়ে আসেন সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে। ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্ব 'চাকমা যুবক সমিতি' এবং ১৯২৮ সালে ঘনশ্যাম

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সংঘ'।[৩] এই সংগঠন দুটির কার্যক্রম ও কর্মবিস্তৃতি ছিল খুবই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। সংগঠনের সদস্যপদ নির্দিষ্ট ছিল চাকমা যুবকদের জন্য। ফলে তা চট্টগ্রামের সকল উপজাতি ভিত্তিক, এমন কি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায়, চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত জনগণেরও সংগঠন ছিল না। এরপর বিশ দশকেই গড়ে ওঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'জন সমিতি' নামে একটি গণ সংগঠন যা ছিল সকল সম্প্রদায়ভিত্তিক একটি সংগঠন। এই সমিতির কর্ম কমিটির সভাপতি হন কামিনী মোহন দেওয়ান।[৪] জন সমিতির মূল কর্মকান্ড স্থানীয় অভাব-অভিযোগ দেখাশোনা এবং তা দূর করার চেষ্টার মধ্যে সীমিত ছিল। প্রথম দিকে জন সমিতির রাজনৈতিক প্রেরণা তেমন তীব্র ছিল না, তাই দেখা যায় এ সংগঠনগুলো জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগে স্থাপন করতে পারেনি বা যোগাযোগ তেমন আগ্রহী হয়নি। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখতে উপমহাদেশ বিভক্তির আগে স্ব স্ব সার্কেলের জন্য দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা দাবী করেন বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে। ভারতের ভাগ্য নির্ধারনের তিন শক্তি তাঁদের দাবির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না। পরবর্তীতে তাঁরা প্রস্তাব রেখেছিলেন তিন সার্কেল, ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া রাজ্যকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করতে, যা থাকবে কেন্দ্র শাসনাধীনে।[৫] এক্ষেত্রে রাজারা ব্যর্থ হয়ে কৌশল বদলান এবং চাকমা রাজার পৃষ্টপোষকতায় ১৯৪৬ সালে গঠন করা হয় 'হিলম্যান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভূক্তির জন্য তদবির ও রাজাদের আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা করা।[৬]

ভারত বিভক্তির পরবর্তী সংগঠনসমূহ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কামিনী মোহন দেওয়ানের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি নিয়ে গঠিত হয় 'হিল ট্রাক্টস্ পিপলস্ অর্গানাইজেশন'।[৭] জনসমিতি এবং হিলম্যান এসোসিয়েশন পাকিস্তান সৃষ্টির পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে সংগঠন গড়ার তৃতীয় প্রচেষ্টা ছিল এই হিল ট্রাক্টস পিপলস্ অর্গানাইজেশন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি জনকল্যাণ পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনটি গোপন হলেও পার্বত্যবাসীদের দাবী আদায়ে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীতে সংগঠনটি তার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ে।[৮]

১৯৫৭ সালে গঠিত হয় 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি'। উপজাতি ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমিত ছিল পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ভূমিকা। ১৯৬৬ সালে রাঙামাটি সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র সমিতির কাজের পরিধি বেড়ে যায় এবং এসময় থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রীতি কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম দেওয়ান, পরিমল চাকমা, পংকজ দেওয়ান, উষাতন তালুকদার, স্নেহময় চাকমা, প্রমুখ নেতা প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির অবদান অপরিসীম। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন অনেক নেতা ও কর্মী কর্মজীবনে পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। উনসত্তরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিজেও পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন। তিনি পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রাক্তন নেতা ও কর্মীদের সংগঠিত করা শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ করে পুরো উত্তরাঞ্চলে তিনি ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। এ প্রচেষ্টায় পাহাড়ি ছাত্র সামিতি যোগ্য ভূমিকা নেয়। ফলে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৯]

সমতলীয় বৌদ্ধদের সংগঠন সমূহ

ভারত বিভাগ পূর্ব সংগঠন সমূহ

সমতল অঞ্চলে প্রখ্যাত বৌদ্ধ নেতা কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী (নাজির) ১৮৭৯ সালে 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। হারবাঙের ভিক্ষু গুনামেজু মহাথেরো এই সংগঠনের সভাপতি এবং নাজির কৃষ্ণ এর সচিব নিযুক্ত হন। বৃটিশ সরকারের নিকট তাঁরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এবং সে সময় থেকেই বৃটিশ সরকার বৌদ্ধদেরকে একটি পৃথক সম্প্রদায় বলে স্বীকৃতি দেয়।[১০] এই সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা একত্রিত হয় এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। নাজির

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণের পৃষ্টপোষকতায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ থেকে 'বৌদ্ধ বন্ধু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংগঠনটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম কলেজে খোলা হয় পালি বিভাগ। নাজির কৃষ্ণ চৌধুরীর আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থল এনায়েত বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বৌদ্ধ বিহার।[১১]

১৮৮২ সালে শ্রদ্ধেয় কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির কর্তৃক কলকাতায় 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা' এবং ১৯০১ সালে কলকাতায় 'ধর্মাঙ্কুর বিহার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমগ্র কলকাতায় এটিই প্রথম বৌদ্ধ বিহার যার মাধ্যমে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করা হয়।[১২] ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডা. ভাগীরথ চন্দ্র বড়ুয়া কর্তৃক 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার' এবং বৌদ্ধদের আর্থিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমবায় আরবান ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৩] ১৯২৪ সালে ধর্মপাল মহাস্থবিরের নেতৃত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসম্মেলন'। কৃপাশরণের অনুপ্রেরণায় স্যার আশুতোষ বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। এ সময়ের পর থেকে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে।[১৪] ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে দু'দিন ব্যাপী অগ্রসর জয়ন্তী এবং এ উপলক্ষে আগত বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদদের ধর্ম ও সমাজ উন্নয়ন মূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বৌদ্ধদেরকে নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এতদঞ্চলের বৌদ্ধদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। এসব কার্যক্রম বৌদ্ধদের মধ্যে নবচেতনার সৃষ্টি করে।[১৫]

বৌদ্ধ সমিতির সুপারিশক্রমে পাহাড়তলী গ্রামের রেবতী রমন বড়ুয়া এম, এ, মহোদয়ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। আর সমাজ হিতৈষী পাহাড়তলী গ্রামের ব্যারিষ্টার ডক্টর অরবিন্দু বড়ুয়া এম, এ, পি, এইচ, ডি (লন্ডন), বার, এট, ল, ইংরেজ রাজত্বকালে অবিভক্ত বাংলায় সর্ব প্রথম বৌদ্ধ সমাজ থেকে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যপদ লাভ করে যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার থেকে সর্ব প্রথম বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যপদ লাভের পর তিনি হলেন কলিকাতা করপোরেশনের চীফ এডুকেশন অফিসার।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ -পরবর্তী সংগঠনসমূহ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরে পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে সকল বৌদ্ধ সংগঠনসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের নামগুলো সরকারী নথিপত্রে তালিকা ভুক্ত হয়। নিম্নে এ সংগঠনগুলোর পরিচিতি প্রদান করা হলো।

সরকারী নথিপত্রে তালিকাভূক্ত সংগঠনসমূহ

ভারত বিভক্তির পর কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ সংগঠন বৌদ্ধদের উন্নয়নের জন্য ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হয়। সরকারীভাবে এই সংগঠনগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে সকল সংগঠনই যে সফল ভাবে ভূমিকা রাখে তা নয়। এর কোন কোনটি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে শেষে ব্যর্থ হয়। আবার কোনটি সাফল্য লাভ করে স্বীয় উদ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সব সংগঠন সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি

বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন ও স্বীকৃত প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হচ্ছে 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি'। বৌদ্ধ সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানই এ সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে বৌদ্ধরা প্রয়োজনমত তাদের অভাব-অভিযোগ সমূহ সরকারের কাছে তুলে ধরে। এটা কোন দলীয় শাখারূপে কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভূক্ত নয়। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এটা। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা হলেন-

১. শ্রী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভিক্ষু, পিতা- হরিধন বড়ুয়া, গ্রাম- সাতবাড়িয়া, থানা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

২. রায় বাহাদুর ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, এম, এ, বি, আই, গ্রাম- বৈদ্য পাড়া, থানা- বোয়ালখালী, জেলা- চট্টগ্রাম।

৩. বাবু সারদা প্রসাদ বড়ুয়া, বি,এ,বি,আই, পিতা- বিশ্বম্ভর বড়ুয়া, গ্রাম- আবুরখীল, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

৪. বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র বড়ুয়া, বি,এ,বি,আই, পিতা- হরিরাজ বড়ুয়া, গ্রাম- মুকেটনাইট, থানা-পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বাবু ফনী ভূষণ বড়ুয়া, বি,এ,বি,আই, পিতা- সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া, গ্রাম- পাহাড়তলী, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।[১৭]

এর পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন গুলোও কাজ করেছে। কিন্তু তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা এসব সংগঠনগুলোর নেতৃত্বদানকারী বৌদ্ধ সদস্যগণের সাথে চিটাগাং বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশনের সম্পর্ক ছিল তিক্ততাপূর্ণ। চিটাগাং বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে থাকাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মত বিরোধের জন্যই আগ্রহী বৌদ্ধ সদস্যগণ পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। যদিও সংগঠন গুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রায় একই রকম।

স্ট্যান্ডিং কমিটি ইস্ট পাকিস্তান বুড্ডিষ্ট কনফারেন্স

বৌদ্ধদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৪৭ সালের ২২ শে জুন 'স্ট্যান্ডিং কমিটি ইস্ট পাকিস্তান বুড্ডিষ্ট কনফারেন্স' সংগঠনটি গড়ে ওঠে। এর সদস্যগণ হলেন-

১. বাবু রেবতী রমন বড়ুয়া, অবঃ ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম ... সভাপতি।

২. বাবু উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, পাহাড়তলী, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম।

কয়েকমাস পরে বাবু রেবতী রমন বড়ুয়া তার সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলে উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী সেক্রেটারী হিসেবেই এই সংগঠনটির কাজ চালিয়ে যান।[১৮] যদিও এ সংগঠনটির মাধ্যমে গঠনমূলক কোন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি

'পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি'- সংগঠনটিও একই ভাবে ভারত বিভক্তির পরে গড়ে ওঠে। এর সদস্যগণ ছিলেন-

১. আধারলাল বড়ুয়া, পাহাড়তলী, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম ...সভাপতি।

২. সুবোধ চন্দ্র বড়ুয়া, পাহাড়তলী, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম ...সম্পাদক।

এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ- সুবিধা ছিল এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সংগঠনটি তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরত।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ'- সংগঠনটির জন্ম হয়। নিম্নোক্ত ব্যাক্তিগণ এর সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১. বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, হোয়ারাপাড়া, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম ...সভাপতি।

২. বঙ্গীশ ভিক্ষু, বি,এ, আবুরখীল, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম ...সম্পাদক।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের কামিনী মোহন দেওয়ান এর সদস্য ছিলেন। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য হচেছ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে বৌদ্ধদের উন্নতির পথে পরিচালিত করা।[২০]

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ লীগ

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন রূপে ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ লীগ' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার ছিল এ সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং সঠিক পন্থায় এর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়নি। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এর সদস্য রূপে কাজ শুরু করেন এবং কমিটি সংগঠনে সচেষ্ট হন।

১. কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দী, পাহাড়তলী, থানা-রাউজান, জেলা- চট্টগ্রাম ...সভাপতি।

২. অমিতাভ চৌধুরী, সাতবাড়িয়া, থানা-পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম ...সহ-সভাপতি।

৩. সচীভূষণ বড়ুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম ... সম্পাদক।[২১]

বেঙ্গল- আরাকানীজ বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন

কক্সবাজারে আরাকানী বৌদ্ধদের (যারা সেখানে বসবাস করে আসছে) নিয়ে গড়ে উঠেছে 'বেঙ্গল- আরাকানীজ বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন'। এদের কার্যকলাপও যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয় এবং এরা পাকিস্তান-আরাকানী বৌদ্ধদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সংগঠনটির কাজ পরিচালনা করেন-

১. কিয়াও জান হলা, ...সভাপতি।

২. মেইং নী ...সহ-সভাপতি।

৩. মং হ্ব ... সম্পাদক।

৪. ন গা মেই ... সহ-সম্পাদক।[২২]

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এদের মধ্যে কিয়াও জান হলা ও মং হ্ব বার্মায় ফিরে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ সংগঠন সমূহের একত্রীকরণ কমিটি

ইতোপূর্বে গঠিত বিভিন্ন বৌদ্ধ সংগঠন গুলোকে একত্রিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫০ সালে গঠিত হয় 'বৌদ্ধ সংগঠন সমূহের একত্রীকরণ কমিটি' কিন্তু সংগঠনটি এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এর সদস্যগণ ছিলেন-

১. প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ ...সভাপতি।

২. শীল ব্রত বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ...সম্পাদক।[২৩]

রাঙামাটি আনন্দ বিহার কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রামে 'রাঙামাটি আনন্দ বিহার কমিটি' নামে একটি কেয়াং কমিটি গঠিত হয়েছিল নিম্নোক্ত বৌদ্ধ সদস্যদের নিয়ে।

১. সভাপতি- উ উভানা মহাস্থবির ভিক্ষু, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

২. সহ-সভাপতি- রায় বাহাদুর, ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া- এম,এ,বি,আই, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৩. সহ-সভাপতি- রায় বাহাদুর বিরুপেক্ষ রায়, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৪. সহ-সভাপতি- বলভদ্র তালুকদার, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৫. সম্পাদক- রাজেন্দ্রনাথ তালুকদার, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৬. সহ-সম্পাদক- মংশু প্রু, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৭. সহকারী সম্পাদক- জীবন রতন চাকমা, রাঙামাটি, জেলা- পার্বত্য চট্টগ্রাম।[২৪]

এই সংগঠন সম্পর্কিত ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটি রিপোর্টে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়- "Report of B.I.O. (II) dated 12.7.1950.

I beg to report that there is no Buddhist Organisation except a Keyong Committee under the name of Rangamati Ananda Behar Committee and the following are the office bearers of the said Committee:-

1. President- U Uavana Mahasthnbir Bhikshu, Rangamati,
P.S. Kotwali, Bist. Ctg. Hill Tracts.

Dhaka University Institutional Repository

2. Vice-President- Rai Bahadur Dhirendra Lal Barua A. B. L.
Lawyer Lagistratc, Rangamati, C. H. T.

3. -do- Rai Bahndur Birupeksha Ray, ... D. C. of Civil Supply, Rangamati.

4. -do- Balabhadra Talukdar, S. D. C. Rangamati.

5. Secretary - Rajendra Nath Talukdar, Teacher, Rangamati

6. Joint Secretary Mongsue Prue, Welfare officer, Rangamati.

7. Asstt. Secy. Jiban Ratan Chakma, Clerk D. C's. office. Rangamati.

Besides this, Kamini Mohan Dewan s/o Trilochan of Baradam, P.S. Kotwali, Dist, Ctg. Hill Tracts is a member of the Purba Pakistan Buddha Kristi Prachar of Chittagong.

Secretary
District Intelligence Brance,
No. 1485/ 14-48/ R. 1109
Rangamati, the 13th July'50" **

Dhaka University Institutional Repository

"বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ" সংগঠনটির গঠন ও কার্যক্রম

বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ- এর গঠন

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে গতিশীল ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দানের জন্য উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত আবুরখীল গ্রামে 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬] সে সময় অগ্রণী বৌদ্ধ সমাজের নেতা চট্টগ্রাম জজকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল পাহাড়তলী গ্রামের উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী, অধ্যাপক সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, শ্রীমৎ প্রজ্ঞালঙ্কার মহাথেরো, শ্রীমৎ ধর্মালোক মহাথেরো, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির প্রমুখের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যোগ্য নেতৃত্বদানের জন্য তদানীন্তন ত্রিরত্নাঙ্কুর সমিতির তত্ত্বাবধানে হয়ে গঠিত হয় 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' সংগঠনটি।[২৭] এই সংঘের প্রথম সভাপতি হন শ্রীমৎ ধর্মাদর্শী মহাথেরো ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির ও শ্রীমৎ জিনরতন স্থবির এর প্রথম সহ-সভাপতি এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু ও ধর্মবংশ ভিক্ষুকে।[২৮]

সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য দু'টি। প্রথমত, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্য রক্ষা করা। দ্বিতীয়, বৌদ্ধ জনগণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘে নথিপত্রে যে ভাবে এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো ঃ

> "কায়মনোবাক্যে ও জীবিকায় সত্য দৃষ্টিযুক্ত অহিংসা মৈত্রী-করুণাময় নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনক্রমে জীব জড়ের প্রকৃতিতে অনিত্য দুঃখে অনাত্ম লক্ষণের উপলব্ধি ও মনন সংজাত লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রশমক প্রজ্ঞার দ্বারা মানবের সর্ববিধ দুঃখে আত্যন্তিক নিবৃত্তির আদর্শে বুদ্ধ প্রবেদিত শিক্ষায় (ক) যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তার ধারাবাহিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং (খ) এই সংস্কৃতি পরায়ণ জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় স্বাবলম্বন মূলক অভ্যুদয়ের পথে মৈত্রী সূত্রে সমবায় নীতিতে সর্বাংগীন উন্নতিমূলক কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপন ও প্রসারিত করা এবং তৎকল্পে কার্যসমূহ সম্পাদন করা।" [২৯]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ- এর কার্যক্রম

ভারত বিভক্তির পূর্বে ১৯৪৬ সালে এবং ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক সদস্য তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও এরকম সংকটজনক পরিস্থিতিতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।[৩০] এ রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধদের সঠিক পথ নির্দেশ দেয়ার জন্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার শিলক গ্রামে বৌদ্ধদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন আহবান করা হয় বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের উদ্যোগে।[৩১] এই সম্মেলনে যোগদান করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদারপন্থী মুসলিম লীগ নেতা হাবিবুল্লাহ বাহার। এ সম্মেলনের দুইটি লক্ষ্য ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ বর্তমান অবস্থায় বৌদ্ধদের ইতি কর্তব্য নির্দ্ধারণ ও সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ঃ সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মোতাবেক কর্মপরিচালনার জন্যে একটি সুদক্ষ কর্ম পরিষদ গ্রহণ করা। এ দু'টি উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হয় উক্ত সম্মেলনের মাধ্যমে।[৩২] মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দনের মাধ্যমে বৌদ্ধদের অভাব অভিযোগ উল্লেখ পূর্বক বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মন্ত্রী মহোদয় বৌদ্ধ সমাজের হিতার্থে অভিনন্দন পত্র অনুযায়ী সর্ববিধ প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি নতুন রাষ্ট্রে বৌদ্ধদের মর্যাদার সাথে বসবাসের আহবান জানান এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বলেন। এছাড়া তাদের প্রতি মাতৃভূমি ত্যাগ না করে নতুন রাষ্ট্রে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[৩৩] অধ্যাপক সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বৌদ্ধদেরকে এদেশের ভূমিজ সন্তান বলে ঘোষণা করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সংকটময় পরিস্থিতিতে বৌদ্ধরা এদেশ ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৪] সরকারের নিকট একটি চিঠিতে বৌদ্ধরা এদেশে তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কথা এবং হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বৌদ্ধরা তাদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করেনি বলে জানিয়ে দেয়- "..... We beg to inform you that the Buddhist are living peacefully and none left their homes after the Hindu-Muslim communal distrbances with which the Buddhists had nothing to do."[৩৫] সে সময়ে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধেরা 'স্বতন্ত্র জাতি' বলে পাকিস্তান সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি লাভ করে। বৌদ্ধদের কার্যক্রম সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পায় এবং সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যাগুরুদের ন্যায় লাভ করে প্রাথমিক রাজনৈতিক স্বীকৃতি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীতে এবারই প্রথম পূর্ববঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদে জনগণের ভোটের দ্বারা দু'জন বৌদ্ধ প্রতিনিধিকে নির্বাচন করা হয়। বৌদ্ধরা সংখ্যাগুরু জনগণের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করে এবং স্বাধীন ভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা করে।[৩৬]

এই মহাসম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পূণর্গঠিত হয়। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির সভাপতি, উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া সহ-সভাপতি এবং শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। বৌদ্ধদের ব্যাপক আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এ মহাসম্মেলনে। যেমন- বৌদ্ধ ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য ব্যয়িত অর্থ তদানীন্তন সরকারকে বাজেটে ১০,০০০/= রুপী থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০/= রুপী করার অনুরোধ জানানো হয়।[৩৭] তাছাড়া দেশে বৌদ্ধ কীর্তি ও প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষণ, জাতীয় কোষাগার গঠন, বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মিশন প্রেরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি শিক্ষার সুযোগ, সরকারী চাকুরীতে বৌদ্ধদের সংস্থান, বৈশাখী পূর্ণিমাকে ছুটি ঘোষণা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এভাবে জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয় বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ সংগঠনটি।

১৯৫০ সালের জুন মাসে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব বৌদ্ধদের প্রথম মহাসম্মেলন। এ সম্মেলনে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মাধ্যমে যোগ দেন সংঘ সভাপতি মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং সম্পাদক বঙ্গীশ ভিক্ষু ও উকিল উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি। এই মহাসম্মেলনে শ্রীলংকার প্রখ্যাত বৌদ্ধ নেতা পন্ডিত মালালাশেখরের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্ব বৌদ্ধ সৌ-ভ্রাতৃত্ব সংঘ বা World Fellowship of Buddhist। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের অনুমোদন, এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আঞ্চলিক সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বার্মা, নেপাল, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, জাপান, পিকিং ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং পাকিস্তানী বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মধারাকে তুলে ধরে।[৩৮] এভাবে বিশ্ব বৌদ্ধদের সাথে এদেশের বৌদ্ধদের সংযোগ স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের বৈঠকে প্রদেশের নতুন রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সরকারকে সেজন্য দুই একর জমি দান করার অনুরোধ করা হয়।[৩৯] পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে সকল সরকারী অফিস, দূতাবাস, ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ঢাকায় একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অফিস স্থাপন করা হলে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের সম্পর্ক রক্ষা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন দেশের দূতাবাস সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সহজ বিবেচনা করে মহাস্থের সরকারের নিকট থেকে একখন্ড জমি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। একই সময়ে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম অস্থায়ী বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিহার প্রথমে রামজয় মহাজন লেনে, তারপর হাটখোলা রোডের বার্মিজ কনসালের বাসভবনে এবং সবশেষে জনসন রোডে এক পরিত্যক্ত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬০ সালে কমলাপুরে স্থায়ী বিহার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ বিহার ছিল জনসন রোডেই।[৪০]

এসপর পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারের নিকট পেশ করে। এগুলোর কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১৯৫২ সালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে শ্রদ্ধা জানায় ভাষা শহীদদের প্রতি। ১৯৫৩ সালে বাংলার বরেণ্য পন্ডিত অতীশ দীপঙ্করের বাস্তভিটা পরিদর্শন করে তাঁকে তাঁর জন্মস্থান বিক্রমপুরের বজ্রযোগিণীতে পুণরায় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সমতলীয় বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত একটি আসনে প্রচার সংঘ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংঘের কর্মী শ্রী সুধাংশুবিমল বড়ুয়াকে মনোনয়ন প্রদান করে তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। নির্বাচনে তাঁর জয়লাভ হয়। একই বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, তে পালি বিষয় খোলার জন্য গভর্ণরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।[৪১] ১৯৫৪ সালে ওয়ার্ল্ড ফেলোশীপ অব বুডিডস্ট এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বার্মায়। এর আগে ১৯৫০ সালে কলম্বো সম্মেলনে বাঙালি বৌদ্ধদের সাথে বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের যে সংহতি গড়ে ওঠে তারই ধারাবাহিকতায় বার্মার মহাসম্মেলনে বাঙালি বৌদ্ধদের একটি বিহার প্রতিষ্ঠানে জন্যে একখন্ড জমি দান

Dhaka University Institutional Repository

করতে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৫ সালে সারাদেশে সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করা হয় এবং একটি কমিটি গঠন করা হয় ঢাকায় স্থায়ী বিহার নির্মাণের জন্য ।

১৯৫৬ সালে সারা বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে এদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের আড়াই হাজারতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ জয়ন্তী পালনের জন্য তৈরী করা হয় একটি শক্তিশালী কমিটি। বুদ্ধজয়ন্তী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সংঘের কর্মকর্তা এম, এল, এ শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া। তিন মাস ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন হয় রাউজানে এবং এবং সেখানকার অনুষ্ঠানে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার শরীক হন। [৪২] চট্টগ্রাম শহরের নিয়াজ স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং সে উৎসব উদ্বোধন করেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাবু কামিনী কুমার দত্ত।[৪৩] তিন মাস ব্যাপী এ উৎসব পালিত হয় প্রতিটি বৌদ্ধ গ্রামে। এই বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন পন্ডিত ও কৃতি-ভিক্ষুগণ যোগদান করেন এবং বাঙালি বৌদ্ধরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। ইটালীর ভিক্ষু লোকনাথ, বার্মার পন্ডিত ডাঃ আর এল সোনী, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, কবি জসীমউদ্দিন, ড. এ,এইচ,দানী, অধ্যাপক মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া- প্রমুখ পন্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করেন এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন। সংঘের তদানীন্তন কর্মীদের মধ্যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু, শ্রী প্রফুল্ল কমল বড়ুয়া, শ্রী বসুভূতি মুৎসুদ্দী, শ্রী বিভূতিভূষণ বড়ুয়া (আবুরখীল), শ্রী বিজয়শ্রী বড়ুয়া, শ্রী নৃপেন্দু বিজয় বড়ুয়া, শ্রী বিভূতিভূষণ বড়ুয়া (কর্তালা) ও শ্রী সুরথচন্দ্র বড়ুয়া। এ জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালনের সাথে সাথে সরকারের সাথেও অধিকতর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ময়নামতী, পাহাড়পুর পভৃতি স্থানের প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ প্রথম দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া পাকিস্তানে বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি দান, বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকুরীতে বৌদ্ধদের জন্য আসন সংরক্ষণ, বিভিন্ন স্থানের বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তি সমূহ সংরক্ষণ, বৈশাখী পূর্ণিমাকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা সহ বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে বৈশাখী পূর্ণিমাকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণার দাবী অত্যন্ত জোরদার করা হয়। একই বৎসরে মনীষী অতীশের দেহভস্ম স্বদেশ আনার কর্মসূচী গ্রহণ করে সরকারের কাছে দাবী পেশ করা হয়। প্রতি দু'বৎসর অন্তর সরকারী খরচে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্মেলন উপলেক্ষে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়ে থাকে এ সময় থেকেই।[৪৪]

১৯৫৭ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। একই বৎসরে প্রখ্যাত দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে সভাপতি করে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের অনুকরণে 'পাকিস্তান সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড' স্থাপন করেন। এ বোর্ডের অধীনে সারা দেশে সংস্কৃতি ও পালি কলেজ এবং টোল/চতুস্পাঠি স্থাপন করা হয় যা বিশেষত বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়। এ সময় উত্থিয়াবাসী বৌদ্ধদেরকে রক্ষাকরণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয় তাদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে। এ বৎসর ঢাকা রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়। অবশেষে প্রাদেশিক সরকারও বৌদ্ধদের এ দাবীকে মেনে নিয়ে বুদ্ধপূর্ণিমাকে সাধারণ ছুটির দিন হেসেবে ঘোষনা করেন।[৪৫]

১৯৫৮ সালে তদানীন্তন প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানের সাথে বৈঠকে বৌদ্ধদের বিভিন্ন দাবী পেশ করা হয়।

১৯৫৯ সালে ঢাকা জেলা পরিষদ হলে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন খ্যাতিমান দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, প্রধান অতিথি গভর্ণর জেনারেল আযম খান, উদ্বোধন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, ড. এ, এইচ, দানি, ড. শহীল্লাহ, কবি বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে গভর্ণর আযম খানের কাছে বৌদ্ধ বিহারের উদ্দেশ্য জমিদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সহ স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং গভর্ণর জমি প্রদানের আশ্বাস দেন।

১৯৬০ সালে ঢাকায় স্থায়ী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য জমি লাভ করে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এই বিহার প্রতিষ্ঠার জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দুই কিস্তিতে সাড়ে চার একর জমি দান করেন।[৪৬] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং পুন্ড্রবর্ধনে সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মরাজিক স্তম্ভ দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন সেই ধর্মরাজিক স্তম্ভ -এর নামানুসারে এ বিহারের নামকরণ করা হয় ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার।

১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রথম বেতার মাধ্যমে বুদ্ধবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।[৪৭]

১৯৬১ সালে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মসূচী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালে করাচীতে ভিয়েতনামী বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো হয়। একই বৎসরে সংঘ কর্তৃক থাইল্যান্ডের মহামান্য রাজা ভূমিবল এবং রানী সিরিকিতকে আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এই সম্বর্ধনার মাধ্যমে থাইল্যান্ড ও দেশের মধ্যে বিরাজমান মৈত্রী সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।

১৯৬৩ সালে চীনে আহুত এশিয়া বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের তিন সদস্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, দেবপ্রিয় বড়ুয়া ও শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু - এঁরা যোগ দেন এবং প্রতিনিধিরা চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই- এর সাথে সাক্ষাৎ করে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পবিত্র অস্থিধাতুর একাংশ চীন থেকে পাকিস্তানে আনয়নের প্রস্তাব দিলে চীন তাতে সম্মত হয়। অতীতে গৌরবের স্মারক হিসেবে এই অস্থিধাতু ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের 'অতীশ হলে' সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[৪৮] এছাড়া চীনা বৌদ্ধ সমিতির সাথে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের যোগাযোগ স্থাপন এবং উভয়ের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়। একই সালে পশ্চিম পাকিস্তানে বৌদ্ধদের প্রাচীন কেন্দ্র সোয়াতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক যাদুঘর উদ্বোধনকালীন সরকারের আমন্ত্রণক্রমে সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষুকে প্রেরণ করে উদ্বোধনী উৎসবে অংশগ্রহণ করা হয়। এ বৎসর পাক সরকার বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য 'তমগা-ই-খিদমত' উপাধি প্রদান করেন।

১৯৬৪ সালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রামের রাউজান গ্রামে নিখিল পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্মেলন আহবান করলে সে সম্মেলন উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান। পাকিস্তানের এক সহনশীল পরিবেশে বৌদ্ধদের জীবনের সার্বিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্মধারার প্রতি ব্যাপক সমর্থন জ্ঞাপন করেন তিনি। সে সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে

Dhaka University Institutional Repository

আগত প্রায় আড়াইশ প্রতিনিধি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভবিষৎ কর্মপন্থা নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কার্যধারার মধ্য দিয়ে সেগুলোকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়। এ সম্মেলনে উপলক্ষে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ঢাকা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। রিপোর্টটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

"১৭ বছরের ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও একনিষ্ঠায় গড়ে উঠেছে এ মহাবিহার এবং পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও তার পুরোভাগে এর কর্মীবৃন্দের ক্লান্তিহীন শ্রম ও সাধনার ইতিবৃত্ত এ জায়গার প্রতি ধূলিকণায় ও ইট পাথরে গেঁথে রয়েছে একাকার হয়ে। এর সম্পূর্ণ পটভূমিকা তুলে ধরবার পরিসর এখানে নেই। ভাবীকালের কোন সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিক অথবা এ মহাযজ্ঞের কোন সুধী সামগ্রীক চিত্র তুলে ধরবেন সে আশা অবশ্যই আমরা করি। তবে সংঘের জন্ম থেকেই আজ পর্যন্ত সর্ব্বঅবস্থায় এর বিপুল কর্ম্মপ্রবাহে জড়িত থাকার ফলে যে সামান্য অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চিত হয়েছে তারি আলোকে আজ এটুকু বলতে পারি যে ১৯৪৮/৪৯ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন সেদিন প্রচার সংঘের কর্মীদের মনে ধ্বণিত হয়েছিল অনেকের জীবনের শ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে ও এ মহাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় সভাপতি মাননীয় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের মহোদয়ের দীর্ঘ সাধনা, অপরিসীম ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিপুল অধ্যবসায়। তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের কেন্দ্রীয় তীক্ষ্ণধী সম্পাদক শ্রীযুত দেবপ্রিয় বড়ুয়া এম, যাঁর চিন্তার তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির অসামান্য দীপ্তি, অনন্যসাধারণ ও অপরিসীম কর্ম্মোদ্যম সংঘের স্তিমিত কর্ম্মপ্রবাহে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য আনে। আরো রয়েছেন অন্য এক বিশিষ্ট তরুন শ্রীযুক্ত আশোকরঞ্জন বড়ুয়া, বি, এ, (অনার্স) ই, পি, বি, এস যাঁর কর্ম্মবহুলতা, অপরিসীম নিষ্ঠা এবং বুদ্ধি ও বোধের প্রগাঢ়তা রয়েছে এ প্রচেষ্টার পেছনে। কৈশোরের প্রান্তসীমা থেকে বিপুল ব্যক্তিগত ক্ষতির বিনিময় সমাজকল্যাণের বৃহত্তর ব্রতে এ দুই তরুণের ত্যাগ তুলনাবিহীন এবং আমাদের নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁদের নাম উজ্জ্বল থাকবে। সামগ্রিকভাবে মাননীয় মহাথের ও এ তরুণদ্বয় এ ত্রয়ীর যুক্ত কর্ম্মবহুলতার স্বাক্ষর আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এ বিপুল কর্ম্মপ্রচেষ্টায় গভীরভাবে আরও যুক্ত ছিলেন ডাঃ অধীর চন্দ্র বড়ুয়া ও তার সমগ্র পরিবার, প্রাক্তন বার্ম্মিজ কন্সাল উ হলা অং, পরলোকগত রাজমণি বড়ুয়া এম, এ, শ্রীযুত অতীন্দ্রলাল বড়ুয়া এবং অরো অনেকে। তাদের পিছনে ছিল সমগ্র প্রচার সংঘের বিপুল কর্মীবাহিনী।

এ ব্যাপক সাধনার ফলে সদাশয় পূর্ব্ব পাকিস্তানের সরকার কৃষ্টি প্রচার সংঘকে দু'একর জায়গা দান করেছেন। আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ সহৃদয় সরকারের প্রতি চিরকাল থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ কর্ম্মপ্রবাহের সাথে গভীরভাবে জড়িত আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত দেবপ্রিয় বড়ুয়া এম. এ, মহোদয় তাঁর স্বদেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক অধিবেশনের ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইহার পূর্ণাঙ্গ চিত্র জনমানসে তুলে ধরবেন, এ দাবী সমগ্র প্রচার সংঘের।

এ কর্ম্মসারণীর প্রাণচাঞ্চল্যে ঢাকা ধর্ম্মরাজিক বিহারে প্রতিষ্ঠা এবং এই সেই বিহার যার নামকরণের মধ্যেই রয়েছে আমদের ঐতিহ্য প্রসারিত দেবানং প্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের ধর্ম্মরাজিক বিহারে, যার ভগ্নস্তূপ ঢাকা নগরীর অনতিদুরে ধামরাই গ্রামে ইতিহাসের অম্লান সাক্ষ্যরূপে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আজিকার উত্তরসাধকেরা সম্রাট অশোকের সে কল্যাণব্রতী আদর্শ নিয়ে ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস রচনার প্রয়াসী। পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ সে পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্রতী।"[৪৯]

রাউজানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্মেলনে একদিকে যেমন বৌদ্ধ কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে তেমনি অন্য দিকে অস্থির বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নূতন আত্মবিশ্বাসের বাণীতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারই ব্যাপক স্বীকৃতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান রাউজানে পূর্ব্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্মেলনে যে বাণী পাঠিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রেসিডেন্ট বলেন ঃ "পূর্ব্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম জিলায় পূর্ব্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্মেলন উদ্‌যাপন করিতেছে শুনিয়া প্রীত হইলাম। আমি ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সফলতা কামনা করি। বৌদ্ধেরা পাকিস্তানের শ্রদ্ধাভাজন নাগরিক ও তাঁহারা এটুকু নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে সরকার সব সময় তাহাদের আশা আকাংখার প্রতি গভীরভাবে সচেতন থাকিবেন। আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে বাহিরের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মহল আমাদের বৌদ্ধ নাগরিকদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করিবার যে জঘন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলমান ও বৌদ্ধরা পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছে। অশুভচক্রের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া পারস্পরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মিত্রতা সংরক্ষিত হইক, ইহাই কামনা করি। যুগ যুগ ধরিয়া বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির লীলাভূমি বলিয়া পাকিস্তান গর্ব্ব অনুভব করে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। আগামী দিনে সবাই এর ব্যাপক স্বার্থে পাকিস্তান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরতম সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক, এই কামনা করি।"[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

রাউজান সম্মেলনে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খান তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন ঃ- "আপনাদের কৃষ্টি প্রচার সংঘ এই যাবৎ দেশ, সমাজ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে অদম্য উৎসাহ, শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও আপনারা একান্ত ভাবে দেশ ও সমাজ সেবা করিতে তৎপর রহিবেন।"[৫১]

এ সম্মেলনে গভর্ণর বন্যাবিধ্বস্ত রাউজান আর্যমৈত্রের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পুণর্গঠনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ঘোষনা করেন। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্লাবিত বৌদ্ধদের সুষ্ঠু পূণর্বাসন, বরিশালে ও কক্সবাজারের বৌদ্ধদের কুটির শিল্প উন্নয়নকল্পে সরকারী সাহায্য ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, ছাত্রদের অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থা, বৈদেশিক বৃত্তির ব্যবস্থা, শিক্ষিত বৌদ্ধ যুবকদের জন্য অধিকতর চাকুরীর সংস্থান, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের যথোচিত সাহায্য, গ্রামাঞ্চলে সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি একুশটি প্রস্তাব বৌদ্ধজনগণের বৃহত্তর কল্যাণে গৃহীত হয় এবং সরকার সমীপে পেশ করা হয়। সরকারী উচ্চতর পর্যায়ে সংঘের তরফ থেকে বৌদ্ধদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের সাফল্যজনক প্রয়াস চালান হয়।[৫২]

১৯৬৪ সালের মার্চে ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত দেবপ্রিয় বড়ুয়া বৌদ্ধদের অবস্থা বর্ণনা করেন ও তাদের সমস্যা সম্বলিত এক দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেন। আলোচনাকালীন গ্রামাঞ্চলে বৌদ্ধদের অবস্থা ও নানাবিধ সমস্যা, শিক্ষিত যুবকদের চাকুরীবাকরীর সংস্থান, বৈদেশিক বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে যথোচিত সুযোগ এবং সর্বোপরি বৌদ্ধদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রদেশে বৌদ্ধ বিষয়ক বিশেষ সরকারী বিভাগ খোলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বৌদ্ধদের সমস্যা প্রতিবিধানের আন্তরিক আশ্বাস জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বৌদ্ধদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন, প্রচার সংঘের কার্যাবলীর অভিনন্দন জানান এবং এশীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের কর্মকুশলতার প্রশংসা করেন। সম্মেলনে ৭৫ সদস্য সমন্বিত বিধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সভা গঠিত হয় ও শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোকে পুনর্বার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। বিধায়ক সভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুত দেবপ্রিয় বড়ুয়া পুনর্বার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৫৩]

১৯৬৪ সালের এপ্রিলে সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বরিশাল সফর করেন ও তথায় বৌদ্ধদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তাহাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারের কাছে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন বৌদ্ধ স্কুলে ও পালিটোলে সরকারী সাহায্য, কুটির শিল্পের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যকরী পন্থা সরকার গ্রহণ করেন এবং তার ফলে বরিশালের বৌদ্ধদের প্রভূত উপকার হয়। ১৯৬৪ সালের মে মাসে পিকিংয়ে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর ১৩ শততম মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগ দেওয়ার জন্য চীন বৌদ্ধ সমিতির আমন্ত্রণক্রমে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া সমন্বিত দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল পক্ষকালব্যাপী চীন সফর করেন। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় প্রচার সংঘের আঞ্চলিক শাখা গঠিত হয়। শ্রীযুত প্রতুল চন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৫৪]

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৌদ্ধ নবজাগরণের হোতা অনাগরিক ধর্মপালের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য সিংহল মহাবোধি সমিতির আমন্ত্রণক্রমে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও শ্রীযুত দেবপ্রিয় বড়ুয়া সিংহলে দশদিনব্যাপী সফর করেন। প্রতিনিধিদল শতবার্ষিকীতে যোগদান করেন, সিংহলের গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী, কান্ডিতে সিংহলের রাজগুরু, বিদ্যালংকার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিভিন্ন নিখিল সিংহল বৌদ্ধ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন এবং পাকিস্তানী বৌদ্ধদের অবস্থা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রসংগে আলোকপাত করেন।[৫৫]

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে বরিশাল প্রচার সংঘের আঞ্চলিক শাখা গঠন এবং বরিশাল বৌদ্ধ সমিতির অনুরোধ ক্রমে এই সমিতিকে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের শাখা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী দেবপ্রিয় বড়ুয়া তৃতীয়বার ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং পাকিস্তানে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহস্রতম বার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁকে বিশদভাবে জানান। এই সম্মেলন উপলক্ষে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদ্বয় প্রেসিডেন্টের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিদ্বয় প্রেসিডেন্টকে ঢাকা বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনার কথা জানান ও সেজন্য বর্তমান বিহারের জমি সংলগ্ন আরো আড়াই একর জমি সংঘকে দান করার আবেদন জানান। প্রেসিডেন্ট সম্মেলনের ব্যাপারে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে সর্ববিধ সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন এবং সংঘের গঠনমূলক কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন।[৫৬]

১৯৬৫ সালের মে মাসে কমলাপুর ধর্মরাজিক বিহারে পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ত মন্ত্রী জনাব সুলতান আহমদ এই উপলক্ষে জনসভার উদ্বোধন করেন এবং প্রচার সংঘের কল্যাণমূলক কর্মধারার প্রতি গভীর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডিরেক্টরের ডক্টর এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দ দেব এবং প্রখ্যাত মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল এই সভায় বুদ্ধের বাণী ও দর্শন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এ বৎসর পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আঞ্চলিক শাখা হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকায় অতীশ হল নির্মাণ করা হয়। একই বৎসরে করাচীতে প্রতিষ্ঠা করা হয় বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ শ্মশান।[৫৭]

১৯৬৫ সালে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের সাথে সংঘ প্রতিনিধির এক সাক্ষাৎকারে অতীশ দীপঙ্করের সহস্রতম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন এবং ঢাকায় আন্ত র্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন আরও আড়াই একর জমি দান করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে আশ্বাস প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে সরকার বৌদ্ধদের এ দাবী পূরণ করেন। ঐ বৎসর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের এক প্রতিনিধি দলের পশ্চিম পাকিস্তানের বৌদ্ধ ঐতিহ্য পরিদর্শন এবং সেগুলি সংরক্ষণসহ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য, জমি প্রদান ও অর্থ সাহায্যের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সহ স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ বৎসর পাকিস্তান সরকার মানবসেবা ও জনহিতকর কাজের জন্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা টি, পি, কে অর্থাৎ 'তমগা-ই-পাকিস্তান' পদক প্রদান করেন।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঘী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ কর্তৃক আয়োজিত ধর্মসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলর প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করলে তাঁর নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলার দাবী পেশ করা হয়।[৫৯] এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে বাংলা বিভাগ থেকে পালি বিভাগকে পৃথক করে সংস্কৃত ও পালি বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়।

১৯৬৮ সালে সংঘের তৎপরতা জোরদার করা হয় এবং উদ্যোগ নেয়া হয় আঞ্চলিক কমিটি গঠনের। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'কৃষ্টি' পত্রিকার প্রকাশনাও শুরু হয়।

১৯৭০ সালের প্রচার সংঘের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। একটি অংশের নেতৃত্বে থাকেন বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং অপর অংশে নেতৃত্বে বহাল হন মহাথের জ্যোতিপাল। জ্যোতিপাল মহাথেরের নেতৃত্বাধীন প্রচার সংঘের কমিটিতে সিনিয়র সহ-সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন ভিক্ষু প্রিয়ানন্দ ও শান্তপদ মহাথের। সাধারণ সম্পাদক হন দেবপ্রিয় বড়ুয়া।[৬০]

১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে সংঘ কর্তৃক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারীকে আশ্রয় দান করা হয়। মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এ নেতৃত্বে স্বদেশে এবং জ্যোতিপাল মহাথের-এর নেতৃত্বে বিদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। সংঘের সদস্যদের মধ্যে শ্রী বাগীশ্বর বড়ুয়া, ভিক্ষু জিনানন্দ, শ্রী ননীগোপাল বড়ুয়া, শ্রী সুমতি বড়ুয়া, শ্রী বীরবাহু বড়ুয়া, প্রকৌশলী প্রভাষ বড়ুয়া, শ্রী সুধীরকুমার বড়ুয়াকে পাক সেনারা হত্যা করে।

১৯৭১ সালে সুদীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা। ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি। এছাড়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা দিবসে

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের জন্য ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ত্রিপিটক পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে বেতার সপ্তাহে চার দিন ও টেলিভিশনে দু'দিন।[৬১]

এভাবে বৌদ্ধদের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য গঠিত বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বিভিন্ন কর্ম ধারার মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে যে গতিশীলতার সৃষ্টি হয় সে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধ এবং সমতল এলাকার বৌদ্ধদের প্রচেষ্টা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভারত বিভাগের পূর্বে এককভাবে বৌদ্ধদের কোন সংগঠন গড়ে ওঠেনি। অঞ্চলভেদে এবং সময়ভেদে যে সকল সংগঠন এসময় গড়ে উঠেছিল তা প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তারপরেও এসব সংগঠনসমূহ বৌদ্ধদের অগ্রগতির পথে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে এবং এসব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পর বৌদ্ধরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটি সফল সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ভারত বিভাগের পর। এ সংগঠনটি হলো বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং এর মাধ্যমেই বৌদ্ধরা চেষ্টা করে তাদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে।

447509

===০===

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৩২ (বাংলা), পৃ ঃ ২২।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫।

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৫-৬।

৪. কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের কাহিনী*, রাঙামাটি, ১৯৭০, পৃ ঃ ১৭৭।

5. Aggabangsha Mahathera, *Stop Genoside in Chittagong Hill Tracts*, Calcutta, 1981, P-3.

৬. কামিনী মোহন দেওয়ান, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ১৯২

৭. প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৩৬।

৮. Aggabangsha Mahathera, *op. cit*, P-1.

৯. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৫৫।

১০. Dr. Dilip Kumar Barua & Dr. Mitsuru Ando, *Syncretism in Bangladeshi Buddhism, Japan, 2002, P-77.*

১১. প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৭৭।

১২. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৮০ (বাংলা)* পৃ ঃ ৪০।

১৩. উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দী, *বড়ুয়া জাতি*, চট্টগ্রাম, *১৯৪৫*, *পৃঃ* ৬৭।

১৪. প্রাগুক্ত পৃ ঃ ৬৭।

১৫. চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ পরিচিতি, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, *অনোমা*, বার্ষিক সংকলন, মে, ১৯৯১, চট্টগ্রাম।

১৬. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস, চট্টগ্রাম-১৯৮৬, পৃ-৬২।

১৭. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh National Archieves,* Bundle 69, January 1953, Proceedings. No. 1455 to 1466.

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. *Report of Bouddha Kristi Prachar Sangha,* Dharmarajik Bouddha Bihar, 1996, P-6.

২৭. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, পাকিস্তানে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও প্রচার সংঘ- স্মরণিকা, বুদ্ধ, পূর্ণিমা, ২৫১২, বুদ্ধাব্দ, ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহার থেকে প্রকাশিত, পৃঃ- ৫৮।

২৮. বিমলেন্দু বড়ুয়া, জননন্দিত প্রিয়ানন্দের জীবনালেক্ষ্য- *প্রিয়ানন্দ স্মারক*, ২৬তম সংঘনায়ক, দর্শনসাগর প্রিয়ানন্দ মহাথেরর জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উদযাপনী পরিষদ, ২০০১, পৃঃ ৬১।

২৯. । অধ্যাপক প্রনব কুমার বড়ুয়া, পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, *বৈশাখী পূর্ণিমা স্মারক পত্রিকা*, ১৯৬৮, পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, চট্টগ্রাম। পৃ- ৩৫।

৩০. উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ৩৫।

৩১. Bimalendu Barua, His Holiness Mahasanghanyaka Vishuddhananda Mahathero An Exlted Presonage- *কৃষ্টি*, চতুর্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৯৯০।

৩২. অধ্যাপক প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৩৫।

৩৩. Mahasanghanyaka Vishuddhananda Mahathera Awarded, M.K Gandhi Prize for Non-violet peace, *Magazine of Mahatma Gandhi Peace awarded Cermemony National Committee,* Dhaka-1993.

৩৪. বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, *অর্জিত সাফল্যের ইতিহাস*, (১৯৪৯-২০০১), জানু-২০০২, ঢাকা, পৃ ঃ ৬-৭।

৩৫. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home Political,* Bundle 69, January, 1953, Proceedings No. 1455 to 66, *Bangladesh National Archieves, Dhaka.*

৩৬. Amitav Chaudhury, The Buddhist Heritage of Pakistan. *2500 years of Buddhist Jayant's Soveneir,* Colombo, Srilanka.

৩৭. *Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political,* Bundle 69, January 1953, Proceedings No. 1455 to 66, *Bangladesh National Archieves, Dhaka.*

৩৮. অধ্যাপক প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৫৬।

৩৯. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৫৯।

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫৯-৬০।

৪১. বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, *অর্জিত সাফল্যের ইতিহাস (১৯৪৮-২০০১)* জানুয়ারী, ২০০২, ঢাকা। পৃ ঃ ৬-৭।

৪২. অধ্যাপক প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৩৬।

৪৩. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৫৯।

৪৪. অধ্যাপক প্রনব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. Amitav Chowdhury, op. cit..

৪৭. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১০৬-১০।

৪৮. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬০।

৪৯. প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু, *কঠিন চীবর ও প্রবারণা উৎসবের কার্যবিবরণী*, পৃ ঃ ১-৩, পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ঢাকা, ১৯৬৫।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ-৩-৪

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৬।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৬-২৭।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৭।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৭।

৫৬. প্রাগুপ্ত, পৃ-২৯।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯।

৫৮. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৪৭।

৫৯. শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, কমলাপুর বৌদ্ধ বিহার ও ঢাকা শাখা- *স্মরণিকা*, বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫১২ বুদ্ধাব্দ (১৯৬৮), পৃঃ ৬২।

৬০. বিমলেন্দু বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৬৪।

৬১. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

ভূমিকা

ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মধারাকে অব্যাহত রেখে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরও এদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক কর্মকান্ডে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একইভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও বৌদ্ধ জনগণ অংশগ্রহণ করেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তারা জড়িত হয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সাথে। ফলে তাদেরকেও পাক সেনা ও তাদের দোসরদের জঘণ্য আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। নির্যাতন ও ধ্বংশের হাত থেকে রেহাই পায়নি বৌদ্ধ গ্রাম ও বৌদ্ধ বিহার গুলি। সে সময়ে অনেকেই প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বার্মা ও ভারতে। আর এর পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ বৌদ্ধরা কোন কোন অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল গোপন প্রতিরোধ। সমগ্র বাঙালি জনগণের সাথে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেরই অংশ ছিল বৌদ্ধদের এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগণের দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই হটিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল পাক হানাদার বাহিনীকে।

মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অংশগ্রহণ

বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৌদ্ধ অধ্যুষিত যে সকল এলাকা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামের নাম। এই গ্রামে যুদ্ধ করেছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান মাহমুদ তার দলবল নিয়ে। এছাড়া বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও নেতা রুমী, রশ্মি, কামাল, ইদ্রিস, মোজাম্মেল, চিত্ত, কেদার প্রমুখ এখানে অবস্থান পূর্বক বিভিন্ন দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সেপ্টেম্বরে রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষ হয় আবুরখীলের কেরানীহাটে, এ যুদ্ধে বিকাশ বড়ুয়া শহীদ হন এবং মারা যায় অনেক রাজাকার।[১]

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আশ্রয় নেন আবুরখীল গ্রামে। এছাড়া হাজার হাজার হিন্দু নরনারীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল এ গ্রামটি। প্রচুর সংখ্যক হিন্দু আশ্রয় নেয়ার কারণে গ্রামটি হামলাকারীদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। এ গ্রাম থেকে মদুনা ঘাট, যোল শহর ও কালুরঘাটে ই.পি. আর বাহিনীর সৈন্যদের এবং মুক্তিসেনাদের নিকট খাদ্য সরবরাহ করা হতো। গ্রামে গঠন করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক সমিতি। আরো স্থাপিত হয়েছিল মিনি হাসপাতাল, যেখানে ডাঃ রেনুকনা বড়ুয়া গ্রামের অপরাপর ডাক্তারদের নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন।[২] আবুরখীলের যে সকল যুবক মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- সুহৃদ বড়ুয়া, বিকাশ বড়ুয়া, তেজেন্দ্র বড়ুয়া, লোকনাথ বড়ুয়া, বীরেন বড়ুয়া, ননীমিত্র বড়ুয়া, ত্রিদিব বড়ুয়া, অটল বড়ুয়া, দীপেন্দ্র বড়ুয়া, শান্তিপদ বড়ুয়া, নরেন্দ্র বড়ুয়া, বঙ্কিম বড়ুয়া, তপন বড়ুয়া, রতন বড়ুয়া, রনজিত বড়ুয়া, শীলভদ্র বড়ুয়া, রূপায়ন বড়ুয়া, মানিক বড়ুয়া ও পীযুষ বড়ুয়া। ভারতে আশ্রয় নেয়ার পূর্বে আবুরখীল গ্রামের ড. প্রণবকুমার বড়ুয়া, ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, শ্রী অরুন বড়ুয়া, শ্রী ড. রণজিত বড়ুয়া, সলিল বিহারী বড়ুয়া, গরি বড়ুয়া ও মৃণাল বড়ুয়া কাজ করেছিলেন। শ্রী পুলিন বিহারী বড়ুয়ার বাড়িতেও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছিল আহত মুক্তিযোদ্ধাদের।[৩]

পাহাড়তলী ও পদুয়া গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা গড়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল পদুয়ার জঙ্গলে। পাহাড়তলীর তালতলীর পাহাড় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও রিক্রুটিং সেন্টার। এ কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠন ছিলেন সঙ্গীতাচার্য জগদানন্দ বড়ুয়া। তিনি কাজ করতেন পাহাড়তলীর সাহসী যুবকদের সাথে নিয়ে। রাঙ্গুনিয়া থানার বেতাগী পল্লীতে গ্রামের বৌদ্ধ পল্লীতে গোপনে আশ্রয় নিয়ে কাজ করেছিলেন ক্যাপ্টেন করিম ও ক্যাপ্টেন আলম। এই গ্রামের কিরণচন্দ্র বড়ুয়া চিকিৎসা করতেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের।[৪]

কালুরঘাটের পূর্বপাড়ে হাজারীরচর ও কধুরখীল বৌদ্ধ গ্রামের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এ গ্রামের শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথের, ডাঃ বিরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, বিমলেন্দু বড়ুয়া, ইন্দুভূষণ বড়ুয়া ও চিত্ত রঞ্জন বড়ুয়া, প্রফুল্ল বড়ুয়া, সন্তোষ বড়ুয়া, অমলেন্দু বড়ুয়া, নীহারেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ মেজর জিয়াউর রহমানের সান্নিধ্যে আসেন যখন তিনি কধুরখীলে প্রথম অবস্থান করেছিলেন।[৫] এখানকার

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম, আবদুল মান্নান প্রমুখ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। কালুরঘাটের যুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায়, ২৬শে মার্চ থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে বাঙ্গালী সৈন্যরা পাক আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১১ই এপ্রিল পাক বাহিনী কালুরঘাট ব্রীজে ভীষণ যুদ্ধ করে এবং ব্রীজ দখল করে নেয়। এদিন বাঙ্গালী সৈন্যরা কালুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নিলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সবাজারের পথে, শুভপুরে। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র ধ্বংশ হয় ৩০ মার্চ।[৬] মুক্তিযুদ্ধে এই অঞ্চলে গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে জীবনদানপূর্বক মানবতার সেবা করে গিয়েছেন হাজারীর চরের চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র বড়ুয়া। এ সম্পর্কে 'দৈনিক আজাদী'-তে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকসেনাদের অত্যাচার-নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

"... ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাত থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু বিদ্রোহী বাঙালী সৈন্যরা পাক হানাদারদের সাথে লড়াই করার জন্য স্থান বেছে নিয়েছিলেন কালুরঘাট ব্রীজ সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে। কধুরখীল বড়ুয়াপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলসহ গ্রামের দুটি বিহার ছাড়াও বড়ুয়াপাড়ার প্রায় ঘরেই তারা আশ্রয় নিয়েছে। ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার বাড়ীতে বিভিন্ন কক্ষে রাখা হয়েছে তাঁদের ইউনিফরমের বোঝা ও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। তাঁর ধানের গোলা খুলে দেয়া হয়েছে সৈন্যদের চাল সরবরাহের জন্য। সৈন্যদেরকে বড়ুয়াপাড়ার লোকজন যে যেভাবে পারে সাহায্য করতে থাকে। সেনাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে জল খাবার, চাল-ডাল সংগ্রহ করে আনে, গোলা-বারুদের বাক্স-পেটরা কালুরঘাটের ওপারে বহন করে নিয়ে আসে। নিকটবর্তী ক্ষেত খামার থেকে মূলা, বেগুন, টমেটো, কপি ইত্যাদি তুলে আনে। আশ্রিত সৈন্যদের জন্য রান্না বান্নার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী পাঠানপাড়া, শেখপাড়া, হাজারীরচর এলাকার লোকজন ছুটে আসে আশ্রিত বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। তাদের মধ্যে নুরুল আলম, হারুন মিয়া, আবুল বাশার, ডাঃ চারুচন্দ্র বড়ুয়া মাস্টার পুলিন বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রায় সময়ে দেখা যেত ঐ বাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্রে। কালুরঘাট এলাকা থেকে ইপিআর এর সৈনিকরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বহদ্দারহাট, কাপ্তাই রাস্তার মোড়, চান্দগাঁও, কাজীরহাট, ইস্পাহানি মিল এলাকায় পাকিস্তানী সেনাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে বহুবার। অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কেউ কেউ আহত হয়ে ফিরে এসেছেন। আহতদের চিকিৎসা করেছেন ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও ডাঃ চারুচন্দ্র বড়ুয়া।

Dhaka University Institutional Repository

আহত হয়ে ফিরে এসেছেন। আহতদের চিকিৎসা করেছেন ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও ডাঃ চারুচন্দ্র বড়ুয়া।

পাকিস্তানী সৈন্যরা কালুরঘাট ব্রীজ দখল নিশ্চিত করার পর কালুরঘাট পূর্ব তীরবর্তী আরাকান সড়কে গাড়ীর বহর থামিয়ে দোকানদার, মাঝি, কুলি, শ্রমিক যাদেরকে পেয়েছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছে। তারা বড়ুয়াপাড়া প্রাইমারী স্কুল, ডাঃ বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ী, জ্ঞানোদয় বৌদ্ধবিহার সবখানেই হামলা করেছে। তাদের প্রচন্ড আক্রমণে মুক্তিসেনাদের প্রতিরোধ অবস্থান সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। তারা কড়লডেঙ্গার পাহাড়ি এলাকায় ও পটিয়ার গ্রাম অভ্যন্তরে চলে যায়।"

..."পাক সৈন্যরা প্রতিদিন মুক্তিবাহিনীর লোক সন্দেহে বাস-ট্রাক ও ট্রেন থামিয়ে লোকজন নামিয়ে ফেলতো। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা হতো। নানা কিছিমের জিজ্ঞাসাবাদ চলতো, এমনকি নগ্ন করে দেখা হতো। কাউকে মালাউন, কাউকে মুক্তি আর কাউকে আওয়ামী লীগার বলে সন্দেহ সনাক্ত করা হলে আর রক্ষা নেই। সংগে সংগে বলা হতো ঃ তফাৎ যাও। যাদেরকে বাছাই করে তফাতে রাখা হতো তাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। অন্যান্য যাত্রীদের বাসে কিংবা ট্রেনে 'উঠ যাও উঠ যাও' বলে তুলে দেয়া হতো।. .

.

গভীর রাতে দোহাজারী থেকে ট্রেন এসে থামতো কালুরঘাট পূর্বপাড়ে। ঐ লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে তুলে আনা হতো এই ট্রেনে পাক সেনাদের হাতে ধৃত লোকজনকে। তাদেরকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতো খালি ট্রেনটি শহর অভিমুখে। হাত বাঁধা অবস্থায় এই হতভাগ্য লোকদের নিয়ে যাওয়া হতো কালুরঘাট ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলী করে হত্যা করে ফেলে দেয়া হতো কর্ণফুলীর অথৈ পানিতে। তাদের মধ্যে দৈবক্রমে কেই কেউ আহত অবস্থায় ভাসতে ভাসতে হাজারীর চরে গিয়ে উঠতো। এ ধরণের আহত বহু লোককে ডাঃ চারুচন্দ্র বড়ুয়া গোপনে চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছেন।"[৭]

হাটহাজারী থানার মাদার্শা গ্রামের ডাঃ রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, রাউজান থানার আধারমানিকের ডাঃ অরুন কুমার বড়ুয়া চৌধুরী গোপনে চিকিৎসা করেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। এছাড়া রাউজান থানার হোয়ারাপাড়া, বীণাজুরি, আধারমাণিক, ফতেনগর, হিঙ্গলা, পটিয়া থানার পিঙ্গলা, কর্তালা, বেলখাইন এবং রাঙ্গুনিয়ায় বৌদ্ধরাও ছিল সাহসী। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সাহায্য দিয়ে প্রভূত উপকার করেছিলেন। রাউজানের আর্যমিত্র ইনস্টিটিউশন ছিল শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট ক্যাম্প।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের যোগদান

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা মূলত দুটো দলে বিভক্ত ছিল। একটা হল এফ এফ (ফ্রীডম ফাইটার) মুক্তিবাহিনী, যারা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম, এ, জি ওসমানীর অনুগত বাহিনী; আরেকটা হল বি এল এফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) মুজিববাহিনী নামে পরিচিত। বি এল এফ সরাসরি ভারতীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আপোষহীন ও জঙ্গী কর্মীদের উদ্যোগে গঠিত, যারা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও যোগসূত্রে গ্রথিত ছিল। আবার এই দুই বাহিনীতে একজন কমান্ডার এবং অনেকগুলো সদস্য নিয়ে গঠিত হত। বৌদ্ধ যুব সমাজে বিভিন্ন গ্রুপের সদস্য হিসেবে সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে যেই সব গ্রুপে বৌদ্ধ যুব সমাজ কাজ করেছে তার আংশিক থানা ওয়ারী তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

ফটিকছড়ি থানা-

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার মোঃ নুরুল গণি

সদস্য-চাঁদু বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- শেখ আবু আহমদ

সদস্য- বাবুল বড়ুয়া (নানুপুর) সুনীল বড়ুয়া (পাইন্দং), ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- তপন দত্ত

সদস্য- নেপাল বড়ুয়া, নাথুরাম বড়ুয়া, নরেশ বড়ুয়া, প্রকাশ বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- ভারত বড়ুয়া, সদস্য ...

রাউজান থানা-

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- আহসান উল্লাহ চৌং

সদস্য- আলোজ্যাতি বড়ুয়া,..

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- মোহাম্মদ হাশেম

সদস্য- সুনীল বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- প্রভাকর বড়ুয়া, সদস্য ...

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গুনীয়া থানা-

বি এল এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- সালেহ আহমদ, সদস্য-সুজন বড়ুয়া ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- খোদা বক্স

প্লাটুন কমান্ডার- অমিয় বড়ুয়া (পদুয়া) সদস্য-রাজু বড়ুয়া, (মরিয়ম নগর) কেপু বড়ুয়া, (পারুয়া) সুধন বড়ুয়া, (মরিয়ম নগর) স্বপন বড়ুয়া (পদুয়া)...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- ইসমাইল

সদস্য-সুদত্ত বড়ুয়া (মরিয়ম নগর) ...

পটিয়া থানা-

পটিয়া হতে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম,পি ও সংগঠক সুলতান আহমদ কুসুমপুরীর উদ্যোগ গঠিত বাহিনীতে ছিল ঃ

'এ' কোম্পানী, প্লাটুন কমান্ডার- হাবিলদার আবুল হোসেন

সদস্য-সিপাই সাধন বড়ুয়া (সাতকানিয়া)

'বি' কোম্পানী, প্লাটুন কমান্ডার- হাবিলদার সুজায়েত হোসেন

সদস্য- পরেশ বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ গ্রুপ লিডার আবদু লতিফ হাবিলদার (বুধপুরা)

সদস্য-অমিয় বড়ুয়া, অনিল বড়ুয়া, মিলন বড়ুয়া, দুলাল বড়ুয়া, রাজমোহন বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- শাহ আলম

সদস্য-সুজিত বড়ুয়া, সুরক্ষিত বড়ুয়া, প্রিয়তোষ বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- আবু ছৈয়দ

সদস্য- সুনক্ত বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- মহসীন খান

সদস্য- রাজিব বড়ুয়া, রতন বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- সিরু বাঙ্গালী

সদস্য- মানবেন্দ্র বড়ুয়া মানু (হুলাইন), তাপস রঞ্জন বড়ুয়া (ঠেগরপুনি) ...

Dhaka University Institutional Repository

বোয়ালখালী থানা-

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- মোঃ মাহবুবুল আলম

সদস্য- প্রশান্ত বড়ুয়া (শ্রীপুর) খোকা বড়ুয়া (জেষ্ঠপুরা) ...

বি, এল, এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- রাজেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী

সদস্য- শরত বড়ুয়া (গোমদন্ডী)

ক্যাপ্টেন করিম এর নেতৃত্বাধীন কমান্ডেঃ অমল প্রঃ লাতু, সুকুমার বড়ুয়া

চৌধুরী (বাবুল) (বৈদ্যপাড়া), বিন্দু বড়ুয়া (সারোয়াতলী), ...

সাতকানিয়া থানা-

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- আবু তাহের খান খসরু

সদস্য- অনিল বড়ুয়া, (জামিজুরী) সাধন বড়ুয়া, (জামিজুরী)

মানিক বড়ুয়া (জামিজুরী) মৃণাল বড়ুয়া, ...

এফ এফ গ্রুপঃ কমান্ডার- আ, ক, ম শামসুজ্জামান

সদস্য- মুক্তিমান বড়ুয়া, মনোজ কুমার বড়ুয়া, রতন কুমার বড়ুয়া, ...[৯]

স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধ বিহারের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার হয়ে উঠেছে এক একটি আশ্রয় কেন্দ্র, পরিকল্পনাকারীদের জন্য মুক্ত স্থান এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান। বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা পারস্পরিক মিলনের জন্যও বেছে নিতেন এসব বৌদ্ধ বিহারকে। মুক্তিযুদ্ধ কালে চট্টগ্রামের অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ই.পি. আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের গোপন আস্তানা হিসেবে পরিণত হয়েছিল।[১০] ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে জনৈক কমান্ডারসহ পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়ে অপারেশন চালিয়েছিলেন ঢাকার বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারী রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মরাজিক বিহারে এসে আশ্রয় নেয়। আশ্রিতদের নিরাপত্তা বিধানের মানসে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তাঁর শিষ্য শুদ্ধানন্দ মহাথের ও ধর্মসংঘের দপ্তর সম্পাদক শ্রী জ্ঞানদারঞ্জন বড়ুয়াকে সাথে নিয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনে হোম সেক্রেটারীর

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাক্ষাৎ করেন ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে। কিন্তু হোম সেক্রেটারী স্বীয় নিরাপত্তার বিষয়েই সন্দিহান জানিয়ে মহাথের প্রস্তাবিত বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন।[১১] সেদিনের সেই দুর্দিনে বৌদ্ধরা তাদের বিহার থেকে শত শত আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেয়নি, বরং আশ্রয় প্রদানের সাথে সাথে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে এসব শরনার্থীদের জন্য অন্ন সংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে বহু মুক্তিযোদ্ধার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনেক মহিলাও ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিহারে। এছাড়া বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী বিহারে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন। যেমন- আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী ফনীভূষণ মজুমদার, সাম্যবাদী দলের বর্তমান মহাসচিব শ্রী দিলীপ বড়ুয়া এবং হিন্দু ধর্মীয় নেতা মানবতাবাদী মি. আর এন দত্তগুপ্ত প্রমুখ। চট্টগ্রামের কালুরঘাটের নিকটবর্তী কধুরখীল গ্রামের জ্ঞানোদয় বিহারে একটি কক্ষে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল গোলাবারুদের বাক্স, গ্রেনেড, কার্তুজ ইত্যাদি।[১২] এভাবে অনেক বৌদ্ধবিহারই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করেছিল।

বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ভূমিকা

এদেশে বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় সংগঠন হচ্ছে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। মুক্তিযুদ্ধকালে অত্যন্ত সাহসের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ সংগঠনটি। এর সভাপতি মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বৌদ্ধ জনগণই শুধু নয়, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণের মাঝে সাহসের সঞ্চার করেন। তিনি আহবান জানান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দৃঢ় মনোবল রক্ষার এবং তাদেরকে সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করেন।

এসময় পাক সামরিক কর্মকর্তারা পাকিস্তানে বৌদ্ধদের শান্তিতে বসবাস সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানের জন্য শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে আহবান জানালে মহাথের বৌদ্ধ জনগণ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের প্রস্তাব দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সফরের ব্যবস্থা করেন এবং আরো অনুমতি দিলেন বৌদ্ধদেরকে পরিচিত পত্র প্রদানের। মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের সামরিক শাসকের সহায়তায় বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার বৌদ্ধ গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি পরিভ্রমণ করেন চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালি, পটিয়া, সাতকানিয়া, চকরিয়া, রামু, কক্সবাজার, উখিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

টেকনাফ, মহেশখালী, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, মীরেরসরাই, বাঁশখালী, আনোয়ারা। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড়, বোয়ালখালী, দীঘিনালা, মায়নীমুখ, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা। এছাড়া পটুয়াখালীর তালতলী, আমতলী, গলাচিপা, বরগুনা, খেপুপাড়া, কবিরাজপাড়া, নয়াপাড়া, বৈলতলী কুয়াকাটা সহ মোট ৪২টি গ্রাম ঘুরে দেখেন।[১৩] এ সম্পর্কে তখনকার দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে,

> পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের টি.পি.কে.টি.কে অদ্য হইতে আটদিন চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান সফর করিবেন বলিয়া সংস্থার এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে।
>
> মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো অদ্য চট্টগ্রাম হইতে পটিয়া থানায় বাতুয়া এবং আনোয়ারা থানার তালসারা, রুপুরা, উষাখাইন সফর করিবেন এবং পটিয়া থানার শাহীপুর জুলদিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অবস্থান করিবেন। আগামী ২২শে জুন তিনি জুলদিয়া হইতে আনোয়ারা থানার বটতলী সফর করিয়া চট্টগ্রাম শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। আগামী ২৩শে জুন তিনি বোয়ালখালী থানার চরণদ্বীপ, খরণদ্বীপ, শ্রীপুর, গোপালপাড়া সফর করিবেন এবং অতঃপর রাঙ্গুনিয়া থানার শিলকে অবস্থান করিবেন। তিনি উপরোক্ত স্থানসমূহ লঞ্চযোগে সফর করিবেন।
>
> মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো চট্টগ্রাম হইতে বাঁশখালী থানায় শিলকূপ, জলদি সফর করিবেন এবং অবস্থানের জন্য সাতকানিয়া থানার আধুনগরে ফিরিয়া আসিবেন। ২৬শে জুন তিনি আধুনগর হইতে পটিয়া থানার মুকুনাইট সফর করিয়া চট্টগ্রাম শিবিরে ফিরিয়া আসিবেন। ২৭শে ও ২৮শে জুন চট্টগ্রাম হইতে তিনি রাউজান থানার ভাতুয়া এবং বিনাঝুরি, ফটিকছড়ি থানার আবদুল্লাপুর, জাহাজপুর, নানুপুর ও কোটার পাড় সফর করিবেন এবং কোটারপাড়ে অবস্থান করিবেন। ২৮শে জুন সন্ধ্যায় তিনি চট্টগ্রাম শিবিরে ফিরিয়া আসিবেন। ২৫শে জুন হইতে ২৮শে জুন পর্যন্ত তিনি জীপযোগে সফর করিবেন।
>
> এই সকল স্থানে সামরিক শিবির, থানা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী অফিসারদের প্রতি সফরকারী বৌদ্ধদলকে সকল রকম সহযোগিতা করার আহবান জানান হইয়াছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

মহাথের আরও পরিভ্রমণ করেন যশোর, খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট, কুমিল্লা, ভোলা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চল। মহাথের ও তাঁর কর্মীবাহিনী তিন মাস আট দিনে প্রায় ১২,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেন।[১৫] পরিভ্রমণকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে সভা আহবান করেছেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নরনারীদের সমস্যার কথা, পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা অত্যাচার-নির্যাতনের কথা শুনেছেন এবং যথাসম্ভব তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সকলের প্রতি আহবান জানান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য।

বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তাঁর পরিভ্রমণকালে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে বৌদ্ধদেরকে 'পরিচিতি পত্র' প্রদান করেন। প্রায় ৭০,০০০- এর মত পরিচয় পত্র বিলি করা হয়েছে শুধু চট্টগ্রামেই। প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে এই পরিচিতি পত্র শুধু বৌদ্ধ জনসাধারণকেই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এমনকি, মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও প্রদান করা হয় তাদের ধর্ম-বর্ণ বিচার না করেই। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা সক্ষম হয়েছে নিরাপদে যাতায়াত, তাদের প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র বিলি এবং বিভিন্ন খবরাখবর আদান-প্রদানের। বৌদ্ধ হিসেবে এই পরিচয় পত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং যে কোনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য সীমানা অতিক্রম করে ভারতে চলে যায় অনেকে। অনেকে হিন্দু পরিবার পরিচিতি পত্রের কল্যাণে সীমান্ত অতিক্রম করে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে।[১৬]

মহসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো সফরসঙ্গীর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবরাখবর বিলি এবং প্রচারপত্র বিলি করেন। মহাথের স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে দৃঢ় মনোবল রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করেন। একথা জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের নিজেদের কাজে মহাথেরোর গাড়িও ব্যবহার করেছে। মহাথের তাঁর ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারেও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রাণরক্ষা করেছেন।

মহাথের তাঁর দীর্ঘ পরিভ্রমণে পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর ও মুজাহিদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কথা সাহসের সাথে সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। যথাযথভাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন নৈরাজ্য, লুঠতরাজ, গ্রামে অগ্নিসংযোগ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ, হত্যা, ধর্ষণ ও তল্লাশীর নামে নারীদের উলঙ্গ করাসহ প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ। সে সময়ে যে সমস্ত বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ গ্রামের ক্ষয় ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। ১৯৭১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

২০শে সেপ্টেম্বর সিভিল এফেয়ার্স- এর মেজর জেনারেলকে মহাথের তার এক চিঠিতে রাজাকার ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে জানান যে-...

we beg to state that in all villages visited by us under the aforesaid Police Stations (Mirsarai and Sitakund) we could not have controlled our tears to see the shocking condition of the people including Buddhist Monks in general who have been mercilessly treated, brutally assaulted and severely beaten by Razakars and Mujahids of the aforesaid Police Stations...

Among the villages visited by us, although none escaped from this torture, we would still like to mention the village Maiani under Mirsurai P.S. where men were brutally tortured and women were made naked in the name of so called investigation and operation by the Rajakars...

২৪ শে সেপ্টেম্বর তারিখে আর একটি পত্রে জানান যে, ...

Following an open declaration of Razakars in Bazar saying that the Buddhist of Aburkhil Village (Raozan Ctg.) shall be burnt alive for the cause best known to them. We were alarmed and our delegation went to aforesaid village...

... When we were entering into the main Buddhist Monastery of the aforesaid village, we could have heard the violent voices of looting by the Razakars in a corner of the village when about 14 houses were looted, inmates beaten mercilessly and five innocent persons taken.[১৭]

এরপরও সামরিক কর্তৃপক্ষ বার বার মহাথেরকে বিদেশে গিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করলে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ নুরুল ইসলামের অধীনে। হাসপাতালে ছিলেন তিনি তিনমাস এবং এখানে থাকাকালীন সময়ে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাক্ষাৎ করেন বিশ্বধর্ম ও শান্তি সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ড. হোমার জ্যাক। মহাথের তাঁর নিকট পাকবাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা ও ধর্ষণের বিবরণ তুলে ধরেন। Dr. Jack নতুন দিল্লীতে এ বিষয়ে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। এতে বাইশটি সংস্থা এক যুক্ত স্মারকলিপি পেশ করে। এরপর ওয়াশিংটনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুরূপ এক বৈঠক বসে। বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর প্রদত্ত তথ্য ও বিবরণের ভিত্তিতে ড.জ্যাক কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।[১৮] এগুলো হচ্ছে- (1) 'East Bengal/Bangladesh', (2) 'Dacca Diary', (3) 'Death in Golden Bangladesh', (4) 'Final Resolution'- International Conference on Bangladesh.

ড. জ্যাক দিল্লীতে এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রদান করেন এবং ৭১- এর নভেম্বরে 'Beyond kyoto' পত্রিকায় 'On Visiting Dacca' প্রবন্ধেও তুলে ধরেন অনুরূপ তথ্য- "...

> In Dacca I learned that even 100,00 human beings massacred... the killings are continuing, with the new home guard, the Razakars, adding to the disorder. I realized how badly the eight million Hindus were treated by the West Pak Army... I still conclude that the massacres... in East Pakistan must not be forgotten by the world community any more than those in Germany under Hitler.
>
> ... I could not know until arriving, that the Bangladesh movement and its guerrilla army, the Mukti Bahini, has wide support among the people. Many listen to the daily Bangladesh Radio Broadcasts..."[১৯]

এছাড়া মাননীয় মহাথেরোর সাথে জাতিসংঘের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর থাইল্যান্ড যাত্রাকালে ঢাকায় সাক্ষাৎ হলে তার মাধ্যমে পাকসেনাদের অত্যাচারের নির্মম কাহিনী বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রধান কার্যালয়ে পৌছানো ব্যবস্থা করেন এবং সেই সাথে আবেদন জানান পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী প্রিন্সেস পুন পিসমাই দিসকুল

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পত্র দিয়েছিলেন এবং ঐ পত্রের কপি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট থাইল্যান্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং মহাথেরকে প্রদান করেন। পত্রখানার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"Since there has occured recently a state of unrest in East Pakistan, We have been in great concern over the fate of our Regional Centre, from where any connection with it has been lost since then.

We would therefore ask Your Excellency a favour of the information regarding the situation about the Monks and lay disciples in the above mentioned area. And should there be any asistance on our part that we may be able to do to relieve them of their trouble, we would be obliged to do so provided Your Excellencey could grant us some information or connection there with."[২০]

এভাবে মহাথেরো স্বদেশে অবস্থানপূর্বক বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন চিত্র ফলপ্রসূভাবে প্রচার করতে সক্ষম হন। মহাথেরোর এ সময়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় বলা হয়েছে-

"Between May 13 and August 12, Mahathero travelled over 7,500 miles in Chitagong and the Hill Tracks, Comilla, Khulna, Jessore, Tangail and Barisal trying to bring what little comfort he could do the multitudes that had sufferd the army's repression. But the regorus of the foe and the culminative effort of the heart rendering scens the witnessed were too much and he had to return Dhaka and into hospital."[২১]

জাপান বৌদ্ধ সংঘের সভাপতি শান্তিবাদী ধর্মীয় গুরু নিচিদাৎসু ফুজী গুরুজী লিখেছেন-

"I came to know from venerable Mahathero the most sorrowful stories caused by the Pak occupation Army during the freedom fight and have been shown around the damages, I am really happy to know that the Sangha under the leadership of Ven. Mahathero with leading executive

Dhaka University Institutional Repository

members touring village to village throughtout Bangladesh gave tremendons service for the safety of the Buddhist community and saved thousand of lives irrespective of caste and creed during the state of unrest in 1971."[২২]

জ্যোতিপাল মহাথের ছিলেন বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি। বহির্বিশ্বে তিনি বাংলাদেশের স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তৎপর হন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রথমে আগরতলা পৌছেন। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ এবং বাঙালিদের উপর পাকসেনাদের বর্বরতা, গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতনের বর্ণনা দেন। তাঁর এই বিবৃতি পত্র-পত্রিকা, রেডিওতে প্রকাশিত হয়। তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং চীফ সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছেও বর্ণনা করেন অত্যাচারের কাহিনী।[২৩] সে সময়ে আগরতলায় আগত পঁচিশ জন বিদেশী সাংবাদিকের সামনে বাংলা ভাষায় তিনি বক্তব্য প্রদান করেন তৎকালীন আগরতলার বাংলাদেশ পূর্বাঞ্চলীয় মিশনের সহযোগিতায়। তাঁর বক্তব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন জনাব মাহবুব আলম চাষী। একই সাথে তিনি বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ বন্দরনায়েক এবং জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পাক বাহিনীর অত্যাচারের বিষয় অবহিত করেন এবং বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর সৃষ্টির জন্য আবেদন জানান।

এরপর জ্যোতিপাল মহাথের মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হয়ে দিল্লী গমন করেন এবং ২১শে জুলাই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান পাক বাহিনীর অত্যাচারের নির্মম কাহিনী। পরে জনাব ফকির শাহাবুদ্দিন কে নিয়ে ১৯৭১ সালের ৭ই আগষ্ট শ্রীলংকা পৌছেন। শ্রীলংকায় অবস্থান কালে সেখানকার রাজনৈতিক নেতা, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবি, বৌদ্ধনেতা ও বৌদ্ধধর্মীয় আচার্যদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের সামনে বাংলাদেশের গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি শ্রীলংকার উপর দিয়ে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিমানকে বাংলাদেশে যাতায়াত বন্ধ করা এবং গণহত্যা বন্ধের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির আবেদন জানান। বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য শ্রীলংকায় "সিলোন কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস ইন ইস্ট বেঙ্গল"

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয় যার চেয়ারম্যান ছিলেন জাতিসংঘের শ্রীলংকার স্থায়ী প্রতিনিধি মি. গুণবর্ধণ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মি. অমর দাস ফার্নান্ডো। এ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মিসেস জয়াবর্ধনের বাসভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা ও অন্যান্য বিষয় যথার্থ ভাবে তুলে ধরেন। শ্রীলংকার পত্র-পত্রিকায় পরদিন এসব সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সেখানে বিলি করা হয় বাংলাদেশের তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা ও ইস্তাহার।[২৪]

এরপর তিনি থাইল্যান্ডে গমন করেন। থাইল্যান্ড অবস্থান কালে তিনি বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী প্রিসেন্স পুনপিসমাই দিসকুল এবং মহাসচিব মি. আইয়েমে সংঘবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের উপর পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন এবং অনুরোধ জানান বিশ্ববাসীর প্রতি পাকিস্তান সরকারের চাপ সৃষ্টির জন্য। তাঁর অনুরোধে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের মহাসচিব মি. সংঘবাসী চীন, জাপান, হংকং, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশে অত্যাচারের খবরাখবর প্রেরণ করেন এবং বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রতৃত্ব সংঘের মাসিক মুখপত্রে এই সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় ও তা বৌদ্ধ বিশ্বে প্রচারিত হয়। সে সময়ে তিনি থাইল্যান্ডের যে সকল প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও ভিক্ষুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা হলেন মাননীয় থাই সংঘরাজ, মহামুকুট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভদন্ত ফ্রা শাসন শোভন, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ভদন্ত ফ্রা, ব্রহ্মমনি, মার্বেল টেম্পলের অধ্যক্ষ ফ্রা ধর্মকীর্তি শোভন, ওয়াট পাকনামের অধ্যক্ষ ফ্রা ধর্মাধিরাজ মহামুনি এবং থাই বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের প্রচার বিচারপতি ড. থানিয়া ধর্মশক্তি।[২৫]

থাইল্যান্ড বাংলাদেশের পক্ষে সফল প্রচারণা শেষে জ্যোতিপাল মহাথের জাপান গমন করেন। সে সময়ে জাপানে 'বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল এবং এই কমিটির সভাপতি ছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া-আফ্রিকার ভাষা বিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক ড. টি নারা এবং সাধারণ সম্পাদক বাঙালি মোঃ জালাল আহমদ। এই কমিটির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনের লক্ষ্যে জাপানে তৎপরতা চালান। জনাব ফকিরা শাহাবুদ্দিনকে সাথে নিয়ে জ্যোতিপাল মহাথের জাপানের জনপ্রিয় ইংরেজী পত্রিকা 'Maihichy Daily News' এর সম্পাদক ও সাংবাদিদের কাছে অত্যাচারের বিবরণ দেন এবং পরদিন তা পত্রিকায় ছাপা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এছাড়া বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের বাসভবনে তাঁদের দুটি সভায় সদস্যদের সাথে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের গণহত্যা, অত্যাচার এবং মুক্তিসংগ্রামের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেন। এরপর তিনি দিল্লী ফিরে আসেন এবং রাজধানী নতুন দিল্লীতে ১৯৭১ সালের ১৮, ১৯, ও ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেন। এ সম্মেলনে ৩১ টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বাংলাদেশ থেকে আরও অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ, আর, মল্লিক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।[২৬] দিল্লীতে জ্যোতিপাল মহাথের ভারতের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মি. আর, কে খাদিলকারের সাথে দেখা করে আগরতলায় আশ্রয় প্রাপ্ত বৌদ্ধ নরনারী ও ভিক্ষু শ্রমণদের সাহায্যের জন্যে আবেদন জানান। পরে কলিকাতায় ফিরে এসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে করে তাঁদের বিদেশী কর্মতৎপরতার একটি প্রতিবেদন পেশ করেন সরকারের কাছে।

জ্যোতিপাল মহাথের কর্তৃক বহির্বিশ্বে এভাবে বিশেষ করে বৌদ্ধ বিশ্বে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী যথাযথ ভাবে তুলে ধরায় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে গভীর সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়। তার আবেদনের ফলে কলম্বো বিমান বন্দরে পাকিস্তানী বিমানের অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের ছিলেন বাংলাদেশে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি। আগরতলায় তিনি পন্ডিত জ্যোতিপাল মহাথের-এর সাথে যুক্ত বিবৃতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এবং প্রকাশিত হয় ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বিদেশী সাংবাদিদের মাঝে এ বিবৃতি ইংরেজীতে অনুবাদ করে আহবান জানানো হয় তাদেরকে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে আসার জন্য। এছাড়া তিনি আগরতলায় অন্যান্য কর্মকান্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

শ্রী বাগীশ্বর বড়ুয়া ছিলেন পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অন্যতম স্থপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। তাঁর সময়েই বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার থেকে জমি লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৫ ই জুন তারিখে পাকসেনারা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষু জিনানন্দ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সদস্য হিসেবে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এর সাথে বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনার্থে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গাড়িতে গোপনে অনেক মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের সুযোগ দিয়েছেন এবং বৌদ্ধ যুবক ও ছাত্রদের মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দান করেন। সে সময়ে চট্টগ্রাম শহরে যোগাযোগ ও অন্যান্য কর্মসূচী পরিচালনার জন্য একটি অফিস স্থাপন করা হলে ভিক্ষু জিনানন্দ হন সে অফিসের কর্মাধ্যক্ষ। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বৌদ্ধদের নিরপত্তার জন্য যে পরিচিত পত্র বিলি করেছিল সে রকম পরিচিতি পত্র দিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান যুবক ও হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন। বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি পরিচিতিপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর এ গোপন তৎপরতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'দিন পূর্বে তিনি নিখোঁজ হন।[২৮]

সুধির বড়ুয়া জন্ম রাউজান থানার অন্তর্গত আবুরখীল গ্রামে। তিনি ময়মনসিংহের ঘোষগাঁও সীমান্ত ই, পি, আর বাহিনীর অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন এবং আট বৎসর যাবৎ এই বাহিনীতে কাজ করে আসছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ময়মনসিংহের শ্যামগঞ্জ সেকটরে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৯]

বিকাশ বড়ুয়া রাউজান থানার অন্তর্গত খইয়াখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিপুরার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অম্পিনগর থেকে চট্টগ্রামে আসার পথে বহু পাক সৈন্য ও রাজাকার হতাহত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে অপারেশন চালান। অবশেষে আবুরখীলে পাঞ্জাবী সৈন্য ও রাজাকারদের মোকাবেলা করতে গিয়ে শহীদ হন।[৩০]

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের কেন্দ্রীয় একজন নেতা ছিলেন অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া। তিনি রামু থানার রামু গ্রামের অধিবাসী এবং কক্সবাজের জেলায় পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা। আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন। পাকসেনা ও রাজাকারদের নজরে পড়লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাছের সাথে বেঁধে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।

ননীগোপাল বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। পটিয়া থানার লাখেরা গ্রামে তাঁর জন্ম। অর্থনীতিতে এম, এ করার পর কিছুদিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা

Dhaka University Institutional Repository

শেষে নিয়োজিত ছিলেন আয়কর উকিল হিসেবে। ইংরেজীতে আকর্ষণীয় বক্তব্য দানে পটু নলীবাবু ১৯৭১ সালে মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে করেন এবং পরিভ্রমণ করেন বিভিন্ন অঞ্চল সমূহ। সর্বত্রই বক্তৃতা দান করে বৌদ্ধ জনগণকে আশ্বস্ত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'দিন পূর্বে তিনি নিখোঁজ হন।[৩১]

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মহাসচিব। হাটহাজারী থানার মির্জাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে তিনিই একমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে বৌদ্ধ জনগণের মাঝে সাহসের সঞ্চার করতেন এবং পরে আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নেন। কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং এ সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার জন্য বিশ্ব বৌদ্ধদের প্রতি আহবান জানানো হয়। সে সময় আকাশ বানী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি তিনি প্রচার করেন। সাংবাদিক সম্মেলন এবং আকাশবানীর বক্তৃতা-বিবৃতির খবর সে সময়ে কলিকাতার অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২]

মিলন প্রভাস বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এ সংগেঠনের কর্মকান্ডের সাথে বিভিন্ন ভাবে জড়িত ছিলেন। রাঙ্গুনিয়া থানার পোমরা গ্রামে তাঁর জন্ম। ন্যাপের প্রার্থী হয়ে তিনি পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক সংসদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু জয়ী হতে পারেন নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে যুক্ত ছিলেন।[৩৩]

শ্রী সুকোমল বড়ুয়া বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি রাঙ্গুনিয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি আগরতলায় রেডক্রসের ফিল্ড লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে কাজ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সলিল বিহারী বড়ুয়া বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাথে যুক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নেন। তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতি দানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকসেনাদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। [৩৪]

সে সময়ে আরও যাঁরা বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতির সাথে কাজ করেছিলেন তাঁরা হলেন-

রাউজান থানা, চট্টগ্রাম

১. শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথের, দর্শন সাগর, হোয়ারাপাড়া।

২. শ্রীমৎ সুগতানন্দ মহাথের, হোয়ারাপাড়া।

৩. শ্রীমৎ শাক্যবোধি মহাথের, ডোমখালি।

৪. শ্রীমৎ শ্রী প্রফুল্ল কমল বড়ুয়া, আবুরখীল।

৫. শ্রীমৎ শশীভূষণ বড়ুয়া।

৬. শ্রীমৎ মানবেন্দ্র বড়ুয়া বি, কম, মহামুনি।

৭. শ্রীমৎ বসুভূতি মুৎসুদ্দী, মহামুনি।

৮. শ্রীমৎ ব্রহ্মদত্ত বড়ুয়া, প্রকৌশলী।

৯. শ্রীমৎ আনন্দ প্রসাদ বড়ুয়া, প্রকৌশলী, আবুরখীল।

১০. শ্রীমৎ সুনীল কান্তি বড়ুয়া, কাজলদিঘীর পাড়।

১১. শ্রীমৎ সুদত্ত সেবক বড়ুয়া, হোয়ারাপাড়া।

১২. শ্রীমৎ সুমেধ বড়ুয়া, হোয়ারাপাড়া।

১৩. শ্রীমৎ যতীন্দ্রলাল বড়ুয়া, হোয়ারাপাড়া।

১৪. শ্রীমৎ বেনীমাধব বড়ুয়া, হোয়ারাপাড়া।

১৫. শ্রীমৎ বিজন বিহারী বড়ুয়া, আবুরখীল।

১৬. শ্রীমৎ ডা. পি, সি বড়ুয়া, আধারমানিক।

১৭. শ্রীমৎ শশাঙ্ক বিমল বড়ুয়া, আবুরখীল।

১৮. শ্রীমৎ অগ্রশ্রী মহাথের।

Dhaka University Institutional Repository

পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম

১৯.শ্রীমৎ উ. জিনিতা মহাথের।

২০.শ্রীমৎ উ. নাইন্দা মহাথের।

২১.শ্রীমৎ অশোক বড়ুয়া, বি, এ, (অনার্স), কর্তালা।

২২.শ্রীমৎ শশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া, বাথুয়া।

বোয়ালখালি থানা, চট্টগ্রাম

২৩.শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথের, শাকপুরা।

২৪.শ্রীমৎ তেজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, শাকপুর।

২৫. শ্রীমৎ ইন্দুভূষণ বড়ুয়া, বি, এ, কধুরখীল।

রাঙ্গুনিয়া থানা, চট্টগ্রাম

২৬.শ্রীমৎ নীরোদবরণ বড়ুয়া প্রকৌশলী, ঘাটচেক।

২৭.শ্রীমৎ সুধেরেন্দু বড়ুয়া, পোমরা।

হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম

২৮.শ্রীমৎ রনজন বড়ুয়া, বি, কম, গুমানমর্দন।

সাতকানিয়া থানা, চট্টগ্রাম

২৯.শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের।

টেকনাফ থানা, চট্টগ্রাম

৩০.শ্রীমৎ উ. পন্ডিতা মহাথের, নীলা।

ঢাকা

৩১.শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের, ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার। [৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অবদান

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে যাঁরা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন কাজ করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন-

রাউজান থানা

ড. শাসনরক্ষিত ভিক্ষু, আবুরখীল।

অধ্যক্ষ ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, আবুরখীল।

শ্রী অরুণ কুমার বড়ুয়া, আবুরখীল।

ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, আবুরখীল।

ড. রণজিত কুমার বড়ুয়া, আবুরখীল।

শ্রী মৃনালকান্তি বড়ুয়া, বি, এস, সি, আবুরখীল।

শ্রী প্রণোদিত বড়ুয়া, সংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পী, পাহাড়তলী।

পার্থ প্রতিম বড়ুয়া, পাহাড়তলী।

প্রকৌশলী সরোজ কুমার বড়ুয়া, আবুরখীল।

রাঙ্গুনিয়া থানা

ডা. সামন্তভদ্র মুৎসুদ্দী, এম, বি, বি, এস, নজরের টিলা।

শ্রী স্বপন মুৎসুদ্দী, সৈয়দবাড়ি।

অধ্যাপক বিপ্রদাস বড়ুয়া, ইছামতি।

সাতকানিয়া থানা

শ্রীমৎ শান্তিপদ মহাথের।

শ্রী নলিনীরঞ্জন বড়ুয়া, ফটো সাংবাদিক (বঙ্গবন্ধুর সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন)।

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

অধ্যাপক সরোজকুমার বড়ুয়া, কোটেরপাড়।

ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া, এম, বি, বি, এস, কোটেরপাড়।

শ্রী সুব্রত বড়ুয়া, এম, এস, সি, জানারখীল।

Dhaka University Institutional Repository

বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

শীলব্রত বড়ুয়া, জেলা জজ, বৈদ্যপাড়া।

শ্রী উদয়ন বড়ুয়া, বি, এ, বৈদ্যপাড়া।

উখিয়া, কক্সবাজার

অধ্যাপক জয়সেন বড়ুয়া।

শ্রী সঞ্জয় বড়ুয়া, সাংবাদিক।

মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম

ডা. সন্তোষ বড়ুয়া, এম, বি, বি, এস, তুলাবাড়িয়া।

কুমিল্লা সদর

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের।

সোনামুড়ি, নোয়াখালী

শ্রী শৈলেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, ডি, আই, জি।

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

শ্রী নীলরতন বড়ুয়া, এম, কম, সাতবাড়িয়া।[৩৬]

এদের মধ্যে অধ্যক্ষ ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া বুদ্ধ গয়া, আগ্রা, দিল্লী, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও পাকসেনাদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেন। দিল্লীতে তিনি ভারতের তদানিন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর দিবাকর, বুদ্ধগয়ায় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং বিহারের রাজ্যপাল শ্রী দেবকান্ত বড়ুয়া, আগ্রায় কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কোলকাতার সাংবাদিক সম্মেলন এবং আকাশবানী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে বিবৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার সাথে কাজ করেন।[৩৭]

শ্রী প্রণোদিত বড়ুয়া (ভিক্ষু সুমঙ্গল) অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ উদ্দীপনা মূলক সঙ্গীত রচনা এবং পরিবেশনায় ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন। এছাড়া তিনি দৃঢ় ভূমিকা রেখেছিলেন বাংলাদেশের শিল্পীদের সংগঠিত করতে তিনি চট্টগ্রাম শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংসেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঞ্চলে তিনি বিচরন করেছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। [৩৮]

অধ্যাপক বিপ্রদাস বড়ুয়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আর্কাইভস্ এ কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন কথিকা -লিখতেন স্বাধীনতা, বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারের জন্যে।

শ্রী সুব্রত বড়ুয়া স্বাধীনতা বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । তিনি বেতারে প্রচারের জন্য কথিকা লেখা ছাড়াও সংবাদ সম্পাদনার কাজ করেছেন।

শ্রী পার্থ প্রতিম বড়ুয়া ভারতে সাপ্তাহিক 'অমর বাংলা' প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি গোয়েন্দাগিরিও করেছেন ।

শ্রী শীলব্রত বড়ুয়া মুজিবনগর সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন।

শ্রী রণধীর বড়ুয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ব্রিপিটক পাঠ করতেন বলে জানা যায়।

শ্রী বিপ্লব বড়ুয়া নামে আরও একজন সাহিত্যিক বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর প্রচারিত কথিকা মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের ৫ম খন্ডে বর্ণিত আছে।

শ্রী অনিল বড়ুয়া নামও পাওয়া যায় যিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিকর্মী।

শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া (সুকোমল বড়ুয়ার ভাই) রেডক্রসের ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আগরতলায় তিনি শরনার্থীদের সেবা দান করেন।

শ্রী সুবিনয় বড়ুয়া (সুকোমল বড়ুয়ার ভাই) ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে আর্মস ক্যারি করার (আনা-নেয়া) দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এভাবে অনেকেই ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।[৩৯]

কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। এমন কি সংঘরাজ নিকায়ের নায়ক শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবিরও এই অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পান নি।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যারা নিখোঁজ হয়েছিলেন অথবা পাক সৈন্যরা যাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একটি তালিকা মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের সে সময়ের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে অনেক বৌদ্ধই শহীদ হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের নাম

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম বিভিন্ন নথিপত্রে উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশেরই নাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নাম

উল্লেখিত মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া আরও অনেক বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যারা ত্রিপুরার পালাটোনা কেন্দ্র, হরিণাকেন্দ্র, দেমাগ্রি, অম্পিনগর, বগুড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁরা ক্যাপ্টেন করিম, কমান্ডার শরফুদ্দিন ও মেজর ছোবহানের অধীনে থেকে যুদ্ধে অংশ নেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং অনেক শত্রু খতম করেন।[৪০]

বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এবং মুক্তিযুদ্ধকালে কিছু কিছু বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যুবক ও ছাত্র প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের সাথেও যুক্ত হন।[৪১]

মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ নারীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ নারীরাও সংগ্রামী ভূমিকা থেকে পিছিয়ে থাকেনি। এক্ষেত্রে কিছু নারীদের নাম পাওয়া যায় যারা কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও প্রগতিশীল আন্দোলন এবং ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন- রাউজান থানার শ্রীমতি ননীবালা বড়ুয়া, শ্রীমতি প্রতিভা মুৎসুদ্দী

Dhaka University Institutional Repository

(এম.এ.বি.এড), শ্রীমতি করুণা বড়ুয়া (এ.এ), শ্রীমতি ডা. রেনুকণা বড়ুয়া (এম.বি.বি.এস), শ্রীমতি সুনীতি বড়ুয়া (এ.বি.বি.এড), শ্রীমতি অজিতা বড়ুয়া (বি.এ) প্রমুখ।[৪২]

যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান করে যারা মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অবদান রেখেছেন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে অনেক বৌদ্ধ জনগন বিভিন্ন উপায়ে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ নিজের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদেকে আশ্রয় দান করে, অর্থ বা খাদ্য সাহায্য দিয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে রেখে প্রভৃতির উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন। সেসময়ে মুক্তিযোদ্ধারা যাদের বাড়িতে ও যে সকল গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের কয়েক জনের নামও ঠিকানা বিভিন্ন নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

এভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা নিখোঁজ হয়েছেন অথবা যাদের পাক সৈন্যরা বিভিন্ন সময়ে ধরে নিয়ে গিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শরীক হয়েছেন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় ছুটে এসেছেন- এদের সকলের নাম জানা সম্ভব হয় নি। এছাড়া আরো অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল দল ও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে এবং যারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়দান ও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের নামও তুলে ধরা হয়নি। নাম- না জানা অনেকেই রয়ে গিয়েছেন যাদের সামান্যতম অবদানও মুক্তিযোদ্ধাকালীন সময়ে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বৌদ্ধ শরণার্থী

বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনী যে বর্বর অত্যাচার ও গণহত্যা চালায় তার ফলে অনেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে জানা যায়, "পূর্ব বাংলার নানা স্থানে, বিশেষ করে চট্টগ্রামে যে সংখ্যালঘু বৌদ্ধরা ছিলেন, পাকিস্তানী ফৌজের গুন্ডামি ও বর্বরতায় তাঁরাও অন্যদের মতই নিরাশ্রয় হয়েছেন। তাঁদের মঠ মন্দির ভেঙ্গে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, কুলনারীদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে পাকিস্তানী দুষমনরা যে নরকের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে বেঁচে থাকা অসম্ভব। নিছক প্রাণের দায়েই তাই ২০ হাজার বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলের জঙ্গলে-পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রহ্মদেশবাসী এক বাঙালী বৌদ্ধই এ সংবাদ জানিয়েছে আসামের বৌদ্ধ প্রধান শ্রী জিনরতন মহাস্থবিরকে। আসামের মিজো পাহাড় অঞ্চলেও এসেছেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় ১৫ হাজার বৌদ্ধ এবং তারাও এসেছেন একইভাবে বর্বরতার শিকার হয়ে"।[৪৩] পাক- বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ শরণার্থীরা শুধু জীবনটুকু নিয়ে দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কাঁঠালিয়া, ধনপুর, মাছিমা, সোনামুড়া, উলুবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া, চন্দননগর, আগরতলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে। ভিক্ষু শ্রমণদের অনেকেই ছিলেন বেনুবন বিহারে এবং কেউ কেউ ছিলেন অভয়ানগরস্থ প্রাচ্যবিদ্যা বিহারে।[৪৪]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে যারা শরণার্থী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরী, সন্তোষ কুমার বড়ুয়া প্রমুখ। এরা চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পশ্চিম শাকপুরা গ্রামের অধিবাসী। শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরীর বক্তব্যে জানা যায়, ২০ শে এপ্রিল ১৯৭১ ইং পশ্চিম শাকপুরা গ্রামে পাকবাহিনী তাদের স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে গ্রামে ৫৪ জন লোক মারা যায়। ...পরে পাক বাহিনীর লোকেরা বিভিন্ন বড়ুয়াদের বাড়ী লুণ্ঠন করে এবং পরে অগ্নিসংযোগ করে। শ্রী নীরদবরণ চৌধুরী তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সময় ভারত সীমান্ত পার হয়ে ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন।[৪৫] একই গ্রামের শরণার্থী সন্তোষ কুমার বড়ুয়া বক্তব্যেও দেখা যায়, ২৩শে এপ্রিল পশ্চিম শাকপুরা গ্রামটিতে আগুন জ্বালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যারা বেঁচে ছিল তারা ভারতে পাড়ি জমায়।[৪৬] সুতরাং পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে বৌদ্ধ গ্রামগুলিও রেহাই পায়নি।

১৯৭১ সালের ২২ শে এপ্রিল প্রাচ্যবিদ্যা বিহারের সামনে ভারতের আকাশবানী, আনন্দবাজার, যুগান্তর ও অন্যান্য স্থানীয় পত্রিকার সংবাদদাতা এবং বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট জ্যোতিপাল মহাথের বাঙালী জাতির উপর পাকবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং এই সম্মেলনে বিশ্ব জনমতের সামনে প্রথম বারের মত বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার নির্যাতন ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরা হয়। পরদিন থেকে তা ভারতীয় সংবাদপত্রে, পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, আকাশ বানী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতে থাকে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ, অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ও সেক্রেটারী প্রমুখ বৌদ্ধ আশ্রয় প্রার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়টি অবহিত হন।[৪৭]

ক্রমশ বৌদ্ধ শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নোয়াখালী জেলার অধিকাংশ বৌদ্ধ গ্রাম দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ফলে ঐ জেলার বৌদ্ধরা প্রাণের দায়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের বহু যুবক-যুবতী পশ্চিম বঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানগড়ের রাজা পাকসেনার আক্রমণে ছয়-সাত হাজার উপজাতীয় প্রজাসহ ত্রিপুরায় শরণার্থী হয়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণে বান্দরবানের রাজা-প্রজাসহ প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত আরাকানের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আরও প্রায় পনের হাজার বৌদ্ধ মিজো পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[৪৬]

১৯৭১ সালের জুন- জুলাই মাসে ভারতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক হাজারে। এসব শরণার্থীদের আশু তত্ত্বাবধানের জন্য 'শরণার্থী সংকট ত্রাণ কমিটি' নামে এক অস্থায়ী সংস্থা গঠন করা হয়। আগরতলা বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ মাননীয় আর্যমিত্র ভিক্ষু এই সংস্থার সভাপতি, মাননীয় পূর্ণানন্দ মহাথের কোষাধ্যক্ষ ও শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল,যে সর্বহারা বৌদ্ধ শরণার্থী ভারতে উপস্থিত হয়ে শিবিরে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাদের আহার, ঔষধপত্র ও থাকার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং পরে তাদেরকে আশ্রয় শিবিরে ভর্তির ব্যবস্থা করা। এ ব্যবস্থার ফলে ভারতে আগত বৌদ্ধ শরণার্থী জনগণের বেশ উপকার হয়।[৪৯]

ইতোমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতি নন্দিনী সৎপতি আগরতলার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে বেনুবন বিহারে এসে শরণার্থীদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং প্রস্তাব করেন যে, দুর্দশাগ্রস্থ শরণার্থীদের মাঝে যোগ্য শিক্ষিত ভিক্ষুরা সান্তনামূলক ধর্মোপদেশ প্রদান করতে পারেন। এ প্রস্তাবে জ্যোতিঃপাল মহাথের সম্মতি প্রদান করলে মন্ত্রী মহাশয় সন্তুষ্ট হন। জ্যোতিঃপাল মহাথের পরে পূর্ণানন্দ মহাথেরকে সঙ্গী করে নিয়ে বিভিন্ন শিবিরে শরণাপন্ন লোকদেরকে শোকে সান্তনা, দুঃখে প্রবোধ দান ও বিপদে ধৈর্য ধারণের উপদেশ প্রদান করেন। মাননীয় পূর্ণানন্দ মহাথেরের উপদেশও ছিল গ্রহণযোগ্য। বহুলোক এক জায়গায় বাস করতে হলে কি করে আচার- বিচার করতে হবে, কোন জাতীয় খাদ্য ভোজ্য, আহার- বিহারে স্বাস্থ্য কিভাবে ভাল থাকবে ও রোগ-ব্যাধি হবে না, আগুনের সংযত ব্যবহার কিরূপ হওয়া, উচিত, সকাল- বিকাল সন্ধ্যা- আহ্নিক ব্রতানুষ্ঠান, রীতিমত প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। এভাবে শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করে শরণার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান ফলপ্রসূ হয়েছিল।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বৌদ্ধ জনগণের উপরে পাকবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে বাঙালি বৌদ্ধরা জাতিসংঘের মহাসচিবকে একটি তার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে দেখা যায়, বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে বৌদ্ধ উথান্টের কাছে বাঙালী বৌদ্ধদের তার।

"ইয়াহিয়া ফৌজের রোষানল থেকে বাংলাদেশের ৫ লক্ষ বৌদ্ধও বাদ পড়েনি। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জুড়ে পাক ফৌজ বৌদ্ধ গ্রামগুলিতে ঢুকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দিয়েছে।

পাক হানাদারের অত্যাচার থেকে বাঙালী বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরাও নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কুমিল্লার পূর্ণানন্দ মহাস্থবির গুরুতর আহত। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি জ্যোতিপাল মহাথের কোন ক্রমে প্রাণ নিয়ে বরইগাঁও বিহার থেকে পালিয়েছেন। চট্টগ্রামের রাঙামাটি রোডের রাউজান থানার বৌদ্ধগ্রাম বিনুজড়ির ওপর নেমে এসেছে মধ্য রাত্রির অন্ধকার।

চট্টগ্রাম মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পাক ফৌজের অত্যাচারের ভয়ে কিছু বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে চলে গেছেন দূরে এক গ্রামে।

বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধরা আসছেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা হয়ে কয়েক শত পরিবার ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসেছেন। কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা কিছু দুর্গত বৌদ্ধ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন।[৫১]"

বৌদ্ধ জনগণের উপর পাক বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের সংবাদ যখন বিভিন্ন দেশের সংস্থাসমূহে পৌছে তখন পাক সরকার নিয়ন্ত্রিত ঢাকা সহ পাকিস্তানের সকল বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় যে, পাকিস্তানী বৌদ্ধদের উপর কোন উৎপীড়ণ হয়নি কিংবা কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং বৌদ্ধরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাস করছে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ভারত সরকার এক প্রস্তাবে সম্মত হন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সাব- ডিভিশনের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত বৌদ্ধ জনগণকে পৃথক করে স্বতন্ত্রভাবে একটি শিবিরে একত্রিত করা হোক। এর ফলে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত তোতাবাড়ী পাহাড়ে বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র শিবির নির্ধারণ করে সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল বৌদ্ধ শরণার্থীদের স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে বৌদ্ধ নামের বিরাট এক সাইন বোর্ড ঝুলান হয়। এই শিবিরের কোন কোন কক্ষে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় পুজার্চনার জন্য এবং এই শিবিরে বুদ্ধ পূর্ণিমার উৎসবও উদযাপন করা হতো। শিবিরের বাইরে পাহাড়ের চূড়ায় বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রতৃত্ব সংঘের ষড়রশ্মি রঞ্জিত পতাকা সর্বক্ষণ উত্তোলন করে রাখা হয়েছিল।[৫২] ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের পক্ষে বৌদ্ধ শিবির চেনা সহজ হয় এবং তারা বৌদ্ধদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকাঃ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধদের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বাঙ্গালীদের দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রামে এ অঞ্চলের বৌদ্ধদের তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের রাজারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের বাইরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তারা এবং তাদের অধিকাংশ অনুসারী- অনুগতরা পাকিস্তান রক্ষার জন্য বাঙ্গালীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শুরু হলে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এবং বোমাং রাজার ভাই পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।[৩৩]

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য- চট্টগ্রামে জাতীয় পরিষদের একমাত্র আসনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে চাকমা সার্কেলের রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদের এ নির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে চারু বিকাশ চাকমা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। তিনিই প্রথম উপজাতি নেতা যিনি বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশের জন্ম সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তিনি চেয়েছিলেন উপজাতি সমস্যার সমাধান। উপজাতি ছাত্র- যুবকদেরও বুঝিয়ে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে। সে সময়ে উপজাতিদের কী করণীয় তা বার বার তিনি বললেও নিজে সেই দায়িত্ব পালন করেন নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়টা মাস তিনি আত্মগোপন করেছিলেন অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলের এক কোণে।[৩৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাদেশিক পরিষদের দুটি আসন ছিল। সত্তরের নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী জয় লাভ করেন দুটি আসনেই। অংশৈ প্রু চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এবং উত্তর অঞ্চল থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। বোমাং সার্কেলের রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন পঁয়ষট্টিতে এবং সেবার তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানীদের সাথে তিনি তেমন সক্রিয় হন নি। রাজাদের মধ্যে একমাত্র মানিকছড়ির রাজা মং প্রু চাই চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য দুই রাজার তুলনায় উপজাতি জনগণের উপর তার তেমন প্রভাব ছিল না।

রাজা ত্রিদিব রায় এবং অং শৈ প্রু চৌধুরী ছিলেন দখলদার বাহিনীর দুই সক্রিয় সহযোগী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে চলে যান ত্রিদিব রায়। আর অং শৈ প্রু চৌধুরী জেলে বন্দী হন স্বাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

পর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার রাজা ত্রিদিব রায়ের মাধ্যমে বিবৃতি প্রচার করে যে, পাকিস্তানে বৌদ্ধরা শান্তিতে আছে এবং যে সামান্য গন্ডগোল বেধেছিল তা ঠিক হয়ে গেছে।[৫৫] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ভূমিকা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে,

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতির প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য অংশে প্রুর মাধ্যমে চাকমাদের অস্ত্রসজ্জিত করে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। উপজাতীয় এলাকাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চাকমা নেতারা সে ফাঁদে পা-ও দিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী কিছু সংখ্যক চাকমাকে সামরিক ট্রেনিংও দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা একাধিক কারণে মোটেই কাজে আসেনি। প্রথমত; চাকমারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতীয়দের সংখ্যা আশি হাজার। দক্ষিণের বোমাং ও উত্তরের মং রাজার অনুগামীরা চাকমাদের কোন কালেই সুনজরে দেখেনি। কারণ, চাকমারা তুলানামূলকভাবে কিছুটা উন্নত এবং অন্যান্য উপজাতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে।
>
> এদিকে রামগড়ের মং রাজা মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নিয়েছেন। এপ্রিল- মে মাসে রামগড় যখন মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল তখন তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর ধনুকধারী টিপরা বাহিনী পাহাড়ে- জঙ্গলে পাহারাদারের কাজ করেছে। রামগড়ে পাকবাহিনীর প্রবেশের পর তিনি সপরিবারে মুক্তাঞ্চলে চলে যান এবং তাঁর অনুগামীরা গভীরতর জঙ্গলে আশ্রয় নেন। বোমাং উপজাতীয়রা তুলানামূলকভাবে আরো অনুন্নত ও অসংহত।[৫৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় নিতান্তই স্বল্প এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে এদের কার্যকলাপ নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদানের পিছনে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই কাজ করেছে এবং রাজনৈতিক ভাবে তাদের যেকোন ভূমিকা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সেজন্য দেখা গিয়েছে চাকমা নেতা ত্রিদিব রায় একবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের মন্ত্রী হন। পরে আবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগের কাছে ধর্ণা দেন। পরবর্তীতে আবারও স্বার্থের কারণে তিনি ফজলুল কাদেরের সাথে হাত মিলিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে তার উপজাতীয়দের নিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির প্রচেষ্টাও তাই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের বিরোধী ভূমিকা কোন রকম প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ব্রিটিশ শাসনামলের পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে ১৯৪৭ সালে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনাধীনে। এরপর এদেশের জনগোষ্ঠী সেখানেই থেমে থাকেনি। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের শোষণ-বঞ্চনা নির্যাতনে পরাধীন বাংলার জনগণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন- বিক্ষোভ করেছে এবং অবশেষে ১৯৭১ সালে পার করতে হয়েছে পুরো নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এসব আন্দোলন- সংগ্রামে বৌদ্ধ জনগণও পিছিয়ে থাকেনি। ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তারা তাদের অবস্থান থেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কোন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় না থাকলেও বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের এ অংশগ্রহণ কোন ভাবেই কম ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজনে তারা যেমন আত্মোৎসর্গ করেছে তেমনি এর পাশাপাশি এদের একটি অংশ (পাহাড়ী বৌদ্ধ) নিজেদের স্বার্থে ১৯৪৭ সালেও যেমন পাকিস্তানী শাসনকে মেনে না নিয়ে বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল, তেমনি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধেও বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পাহাড়ী বৌদ্ধদের একাংশের এই বিরোধী ভূমিকা এ দেশের সমগ্র জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি।

===O===

তথ্যনির্দেশিকা ঃ

১. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ-৩০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ-৩০।

৫. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩১।

৬. দলিলপত্র, নবম খন্ড, ১৯৮২, পৃ ঃ-৪৪-৪৫।

৭. বিমলেন্দু বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে কাপ্তাই ঘাট স্মৃতির আলোকে, দৈনিক আজাদী, ২৬ মার্চ, চট্টগ্রাম, ১৯৭১,পৃ ঃ১।

৮. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*,পৃ ঃ ৩১।

৯. অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া, মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ, আনোমা, স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী, ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অধ্যাপক শ্রী চিত্তপ্রসাদ তালুকদার, বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধ সমাজের ভূমিকা, বোধন, ১ম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, ১৯৭২, পৃঃ-৯।

১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, *চতুর্থ খন্ড*, পৃ ঃ ৬৬৪।

১২. দৈনিক আজাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১, ২০০১।

১৩. দলিলপত্র, *চতুর্থ খন্ড*, পৃঃ ৬৬৭।

১৪. দৈনিক আজাদী, ২১ জুন, ১৯৭১, ৬ আষাঢ় ১৩৭৮, ১১শ বর্ষ, ১৭৭ সংখ্যা।

১৫. দলিলপত্র, *চতুর্থ খন্ড*, ১৯৮২, পৃঃ-৬৬৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬৮-৬৬৯।

১৮. দলিলপত্র *চতুর্থ খন্ড*, পৃষ্টা, ৬৭২।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ - ৬৭২।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ - ৬৭২-৬৭৩।

২১. How Dhaka monks saved many lives, N.C Menon, The Hindustan Times 18th February 1971.

২২. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৩৬।

২৩. জ্যোতিপাল মহাথের , *বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭, পৃ ঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৩।

২৪. প্রাগুক্ত,পৃ ঃ ৩৮-৩৯।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪২, প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ-৬৬।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪, প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ -৬৭।

২৭. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৭-৭৮।

২৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, *চতুর্থ খন্ড*, ১৯৭২, পৃঃ ৬৭৫, পুলিন বিহারী বড়ুয়া, স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধদের অবদান, বোধন, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৩।

২৯. বোধন, প্রাগুক্ত, ১৯৭২ ইং,পৃঃ -১৩।

৩০. প্রাগুক্ত, ১৯৭২ ইং, পৃঃ ১৪।

৩১. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ ৮০।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৮২-৮৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৮৩।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৮৬।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৩৭-৩৮।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬২।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৬৯।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৬৯।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. বোধন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০-২৩।

৪১. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ- ৫৮-৫৯।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ- ৬০।

৪৩. *দলিলপত্র, চতুর্দশ খন্ড*, ১৯৮২, পৃঃ ৮৬৪।

৪৪. জ্যোতিপাল মহাথের, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ- ২৮।

৪৫. *দলিলপত্র, অষ্টম খন্ড*, পৃঃ ৩৩৪-৩৪৫।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

৪৭. জ্যোতিপাল মহাথের, *প্রাগুক্ত*, পৃ ঃ- ২৫।

৪৮. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৩৮০ (বাংলা), পৃঃ ৪৬।

৪৯. জ্যোতিঃপাল মহাথের, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।

৫০. জ্যোতিপাল মহাথের, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯।

৫১. দলিলপত্র, *দ্বাদশ খন্ড*, পৃঃ ৩৪৭।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

৫৩. জ্যোতিঃপাল মহাথের, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ৩২।

৫৪. *Life is not our's: Land and Human Rights In the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission*, May 1991, Page-14.

৫৫. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ৩৯।

৫৬. *দলিলপত্র, চতুর্থ খন্ড*, ১৯৮২, পৃঃ- ৬৭১।

৫৭. *দলিলপত্র : ষষ্ঠ খন্ড*, ১৯৮২, পৃঃ- ৫০১-৫০২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাস কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে হলেও তারা দেশে সামগ্রিক জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক নয়। যুগ যুগ ধরে তারা একই বাঙ্গালী স্বত্তার সাথে মিশে রয়েছে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ সম্প্রদায়ের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গতিশীল উন্নয়নকে ব্যাহত করে। ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায় এবং বৌদ্ধরা নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উপমহাদেশে ইংরেজী শাসনামলে তারা তাদের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করে নিজেদের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হন।

বাংলাদেশের বৌদ্ধরা হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধমতের অনুসারী। তবে এরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও আরাকানী বৌদ্ধ- এ দু'ভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালী বৌদ্ধরা বেশীর ভাগই বাস করে চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চলে এবং এরা বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুসারী। কিন্তু আরাকানী বৌদ্ধরা আরাকানী বংশোদ্ভূত ও আরাকানী সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে চলে। বৌদ্ধ হলেও এদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিল। সুতরাং জীবন-যাপনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাঙ্গালী ও আরাকানী -এ দু'টি শ্রেণী বরাবরই পৃথক থেকেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আরাকানী বৌদ্ধরা বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগকে ব্রহ্মভাষায় 'মার্মাগ্রী' বলে উল্লেখ করত। 'মার্মাগ্রী' শব্দের অর্থ উচ্চ বংশীয় ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ। আরাকানী বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সমগ্র জীবনযাত্রা, বেশভূষা, ভাষা, গোষ্ঠীর ইতিহাস শারিরীক গঠন, দৈহিক আকৃতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে ভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, বহু আরাকানী শব্দ বাঙ্গালী ও আরাকানী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-কেয়াং (বিহার), ফুংগী (ভিক্ষু), ফাং (নিমন্ত্রণ), ফরা (বুদ্ধ), তারা (ধর্ম), চাঙ্কা (সংঘ), ছোয়াইং (পিন্ডদান), থাগা (গৃহী উপাসক), ফারিক (সূত্রপাঠ) ইত্যাদি।[১]

বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হয় এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাদের প্রথম সংগঠন 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' গড়ে ওঠে। এ সংগঠনটি গড়ে তোলার পাশা পাশি তারা তাদের লেখণীকেও শক্তিশালী করে। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির মাধ্যমে বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ তাদের সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়। চট্টগ্রাম ও কলকাতায় বৌদ্ধদের উপাসনা ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধবিহার। পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বৌদ্ধদের উন্নয়নের জন্য। আরাকানী বৌদ্ধরাও সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি। তারাও তাদের স্বীয় স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে গঠন করেছে চাকমা যুবক সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি, হিলম্যান এসোসিয়েশন প্রভৃতি। বাঙ্গালী বৌদ্ধদের চিন্তাধারার সাথে পাহাড়ী বৌদ্ধদের চিন্তাধারার খুব একটা মিল লক্ষ্য করা যায় না। বাঙ্গালী বৌদ্ধরা বৌদ্ধদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যেখানে সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানে পাহাড়ী বৌদ্ধরা কেবল নিজেদের আঞ্চলিকতার স্বার্থে বা উপজাতীয়দের স্বার্থে সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

বৌদ্ধদের সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর। সরকারী নথিপত্রে এ সময়কার বেশ কিছু সংগঠেনের উল্লেখ রয়েছে। এ সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে 'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' সংগঠনটি। জন্ম লগ্ন থেকে এ সংগঠনটি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বৌদ্ধদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং সে সময়কার হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের সংকটময় পরিস্থিতিতে বৌদ্ধদেরকে এদেশ ত্যাগ না করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বৌদ্ধরা এদেশেরই ভূমিজ সন্তান এবং পাকিস্তান সরকার তাদেরকে মাতৃভূমিতে মর্যাদার সাথে বসবাসের প্রতি আহবান জানায়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিও সরকার সে সময় গুরুত্বারোপ করে। এর ফলে দেশের সকল জনগণের সাথে বৌদ্ধরাও স্বাধীনভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করে। বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য এসময় সরকা বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন কারিগরী মহাবিদ্যালয়গুলোতে আসন সংরক্ষণসহ চাকুরীর ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের জন্য বিশেষ বিবেচনা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধরা ধীরে ধরিে এগিয়ে আসে। তাদের কর্মতৎপরতার ফলে সে সময়ে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধদেরকে স্বতন্ত্র জাতি বলে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান সরকার। বৌদ্ধদের মধ্য থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবারও সুযোগ তৈরি হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর বিংশ শতাব্দীতেই প্রথম পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে জনগণের ভোটের দ্বারা দু'জন বৌদ্ধ প্রতিনিধিকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনে বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ও বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান। ১৯৬২ সালে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়, ১৯৬৫ সালে বোমাং রাজা মং শৈ প্রং চৌধুরী এবং তিনি সরকারের মন্ত্রী হওয়ার পর রাজা ত্রিদিব রায় প্রাদেশিক পরিষদের আসনে বিজয়ী হন। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায়

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন এবং একই বছরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি আসন থেকে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা এবং অং শৈ প্রু চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। এ সময়ে বৌদ্ধদের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবী পূরণ করা হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সমতল অঞ্চলের বড়ুয়া বৌদ্ধরা এদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে এবং কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে বা আশ্রয় দান করে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথের দেশের ভিতরে বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্বারা এবং সহ-সভাপতি জ্যোতিপাল মহাথের বিদেশে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে দেশের চিত্র তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। এ সময়কার আরো অনেক বৌদ্ধদের নাম পাওয়া যায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের কাজে জড়িত ছিলেন বিভিন্নভাবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়ী বৌদ্ধদের মধ্যে খুব কমই অংশ নিয়েছে। এদের একটি অংশ ছিল নির্লিপ্ত এবং আর একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এরা ছিল আরাকানী সংস্কৃতির ধারক এবং আরাকান বা বার্মার প্রতি এদের অনুভূতি প্রবল, এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এদের কাম্য ছিল না। এরা নিজেদের উপজাতীয় এলাকায় স্বতন্ত্র মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্খায় মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭ সালেও যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তখনও পাহাড়ী বৌদ্ধদের একাংশ ভারতের পক্ষে এবং আর একটি অংশ বার্মার পক্ষে থাকার জন্যে সে দেশের পতাকা উত্তোলন করেছে। কিন্তু সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালী বৌদ্ধরা সব সময়েই বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতি ছিল অনুভূতিপ্রবণ। তাদের সে পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি সম্মান দেখিয়ে চট্টগ্রামে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ। এরপরেও সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধরা এদেশেরই জনগণের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এবং দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের স্থান তৈরি করতে সচেষ্ট রয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া 'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস' চট্টগ্রাম-১৯৮৬, পৃ- ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

Map of Bangladesh, showing main Buddhist living places by arrow mark (United Nations , Map No.3711,Novenber 1992, modified by Dr. Dilip Kumar Barua and Dr. Mitsuru Ando.)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রস্তাব সমূহ ঃ

EAST PAKISTAN.

BOUDDHA KRISTI PRACHAR SANGHA.

(পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ)

আন্দরকিল্লা ANDERKILA, CHITTAGONG, চট্টগ্রাম

Ref ..... Dated 27- -5-1951.

Extract from the proceedings of the Annual General Meeting of the Purba Pakistan Bouddha krishti Prachar Sangha held under the Presidence of Rev. Visuddhananda Sthavir its president and a member of the General Council of the WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS in the primises of the Chandgaon Bouddha Vihar on 27th May, 1951.

Over 1000 including the visitors were present. Mr. U.C. Mutsuddi hoisted the Religious Flag adopted for the Buddhist World in the World Fellowship of Buddhists at Colombo and sent to him and explained significance that its Six Colours represent Maitri and other qualities of the Lord Buddhas.

Professor S.N. Barua M.A. hoisted the Pakistan Flag and made a fine short speech.

Dhaka University Institutional Repository

Messages of good will sent by the Hon'ble Mr. H. Bahar also regrettin for his failure to attend the meeting and by Consul of Burma sent from Dacca and by the Vice-Consul sent from Chittagong were read.

1. Resolved that this meeting expresses its heartfelt gratitude to the Government specially to the Hon'ble Mr. Nurul Amin the Prime Minister for giving Rs. 10,000/- for the completion of the erection of the chittagong Buddhist Monastery, Rs.10,000/- for the erection of pucca building for the Mahamuni Anglo-Palli Institution founded by the Buddhists and Rs. 3,000/- for the passage of the Pakistan Delegates for attending the World Buddhist Conference at Colombo, Ceylon and it also expresses its thanks to His Excellency the Governor of East Pakistan for donating Rs. 250/- for erection of Alter in the Maiyani-mukh Bouddha Vihar in the Chittagong Hill Tracts.

Resolution No.5.

The Buddhist of Pakistan are the only remnants of the vast ancient Buddhist community of India and have preserved the religion and tradition of Lord Buddha. It was sanctioned by the British Government to give back the most valuable and holy relics of Sariputta and Moggalayan, the two Chief disciples of Lord Buddha when India was not divided, so the Buddhist of East Pakistan are entitled to a portion of Sacred Relics for preservation and worship. It is therfore, resolved that the Government of India and the Mohabodhi Society of India be requested through the Pakistan Government to give a portion of the Sacred Relics to the Buddhists of East Pakistan as was given to the union of Burma.

Proposed by Babu Premananda Barua.

Seconded by Babu Rohini Rajan Barua

B.L.

Dhaka University Institutional Repository

Resolution. 6.

Learnt from the letter of the Secretary of the Mohabodhi Society Mr. Devapriya Valisingha addressed to Sri U.C. Mutsuddi that the Society has agreed to bring the Sacred Relics of Sariputta and Moggalayn it is resolved that East Pakistan Govt. be requested to form an independent reception Committee of leading Buddhists of Entire East Pakistan for the purpose of Management of the affairs.

Resolution 10.

The Mahamuni Mela situated in village Pahartali, P.S. Roazan district Chittagong is the biggest Buddhist Fair which continue for about a fortnight where thousands and thousands of Buddhist pilgrimes from Chittagong and Chittagong Hill Tracts visit annually and thousands and thousands of Hindus and Muslims attend for business but all of them have to face lots of difficulties on account of having no REST HOUSE or any other shelter and for not having sufficient provision for drinking water, latrine, urinals light and sililar other factors, the rain water washed away the earth of the site causing danger to the temple itself which has no been repaired for a longtime the unevennes of the site causes difficulties to the shop-keepers and visitors, the Mela is a private property of the Mong Chief of the Chittagong Hill Tracts who has been refusing co-operation with the local public for better management of the Mela, contrary to the democratic condition of our country. In viee of the above circumstances the meeting resolves that the authority be moved to form a Mela Committee with members representing all sections of interest and the Mong Chief for all round improvement of the Mela so that its loosing and decaying attraction of the people be revived and the Holy place of pilgrimage be saved.

Dhaka University Institutional Repository

Resolution: 12

Resolved that with a view to establish co-operation and friendlines, Pakistan Government be requested to send Good will Mission to the Buddhist Countries.

Resolution : 13

Resolved that the Hon'ble Minister of Education of East Bengal Government be requested to sanction for the appointment of an Inspection Officer of Higher Grade for General and Cultural Education of the Minority Buddhist Community for whose educational advacement, the benign Government has already taken steps.

Resolution : 14

Resolved that the Government be requested to set apart Rs. 25,000/- in the budget for Buddhist education specially for higher education after Matric and for the Post Graduate education and the Buddhist education.

Resolution: 15

It was decided in the East Pakistan Buddhist Conference held at Gairala of Patya on 8.4.51 that the question of separate and Joint electorate with reservation of seats for the Buddhists should be settled through village Units.

This annual conference of East Pakistan Bouddha Kristi Prachar Sangha is of opinion that the resolution for six seats-two in the central and four in the Provincial Assembly for the Buddhist Community through Joint Electorate with reservation of seats which was adopted unanimously in the East Pakistan Buddhist Conference held at Shilok (Rangunia) on the 26th . March, 1950, under the Presidency of Hon'ble Mr. H. Bahar, should be endorsed.

Resolution : 17.

Resolved that in the Pali Tols Primary education also be introduced with sanction of additional money for suitable Grant-in-Aid.

Resolution : 19.

Pali-Sanskrit Board has been abolished since 1949 and consequently no examination was held in Adya, Madhya and Upadhi for the last two years to the detriment of the Pali education.

It is therfore, resolved that Government be moved to revive the Board and to hold the Examination.

Dhaka University Institutional Repository

Resolution : 20.

Resolved that the Hon'ble Education Minister, the Vice Chancellor of the Dacca University and the D.P.I be requested to introduce Pali Honours in B.A. Examination and to appoint a professor and to reduce term of education from 3 to years and to introduce such Pali Honours' Course in the Chittagong Collage and the Sir Ashutosh College.

Resolution: 24.

Resolution was adopted in the World Fellowship of Buddhists at Colombo authorising the Pakistani Delegates to from Pakistan Regional Committee as was done for all Buddhis Countries under the General Council of World Fellowship of Buddhists according to Rule (4a) of the Constitution of the World Fellowship of Buddhists either indipenednt Rigional Centre, may be established or recognition may be given to any existing organisation as Regional Centre. The aims and ohjects of the World Fellowship of Buddhists are almost the same as those of the Purba Pakistan Buddha Krishti Prachar Sangha. It is very difficult to establish a separate Regional Committee.

It is therefore, resolved that the Sangha be recognised as the Regional Committee of Pakistan Branch of the World Fellowship of Buddhists and the Prachar parisad be empowered to co-opt as many members as possible with annual subscription of Rs. 1/= per member.

V.Bhikkhu,

27-05-1951

President.

সূত্রঃ Government of Bengal, B- Proceedings. Home, Political, Bangladesh national Archieves, Bundle-61, April, 1952, proceedings No. 389-91.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংগঠন 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি'র সরকারের নিকট পেশকৃত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি ঃ

Extracts from the proceedings of the Buddhist Conference submitted from the President, Buddhist Association. Chittagong, to the Hon'ble the Prime Minister.

3. In View of the fact the Pali Examinations, Viz, Adya, Madhya and Upadhi Examinations were being held since partition of Bengal, under the Sanskrit Association, Calcutta, up to the year 1948-49 and under the East Bengal Government Sanskrit Advisory Committee, Dacca in the year 1949-50 and thenceforward the said committee has not been working and consequently no examination n Pali under the said committee was held in the year 1950-51 and that at present there is no committee or Association under which Pali Examinations may be held-this Buddhist Conference earnestly requests the Government of East Bengal to see that a committee or Association may be formed and to sanction an amount or Rs. 5,000/- per annum from the current financial year to meet the necessary expenditure.

4. In view of the fact that the Buddhists of East Bengal numbering about 4 lacs of people including those of Chittagong Hill Tracts form and important and distinct Minority Community as regards their religion, culture, civilization, manners and customs, no Buddhist, since the partition of Bengal bas been appointed in the East Pakistan Civil Service (Judicial) and in many other departments under the Government of East Bengal. Such as, Agriculture, Co-operative Relief Commerce Labour and Industry and so on, as well as n many departments under the Government of East Pakistan in as much as no quota of Government Services has been fixed for the Buddhists-this Buddhist Conference requests both the East Bengal Provincial as well as the Pakistan Central Governments to reserve 6% for those of Chittagong District, 93% for those of Chittagong Hill Tracts and 2% for those of East Bengal as a whose giving weightage to them as members of a Minority Community and to appoint them accordingly until they are fully represented in all the departments both under the East Bengal Provincial as well under the Pakistan Central Governments.

Dhaka University Institutional Repository

6. In view of the fact that the cultural heritage riligion and philosopy of the Buddhists of Pakistan who are mainly concentrated in East Pakistan, are embodied in the canonical and non-canonical Pali Literature and it is just and fair that Pali should be given its due recognition in the cultural development of the people of Pakistan, this Buddhist Conference requests the Government of Pakistan and the Government of East Bengal as well as the authorities of the Dacca University to introduce a full fledged department If Pali in the said University with at least 3 duly qualified scholars in Pali, viz. 1 professor, 1 Reader and Lecturer, for facilitating studies in studies in the Post Graduate Classes and Researches in Pali in its various aspects, such as literacy, Linguistic, Epigraphic I conographic Artistic Economic social Religious Philosophical and Historical as well as for helping the University in conducting L.A.,B.A. and M.A. Examinations besides Government Service Competitive Examinations viz. C.S.P., P.P.S., E.P.A.S. and other Competitive Examinations of similar ranks in the subject.

7. In vew of the fact that the Buddhists of East Bengal form an important and distinct Minority Community as regards their riligion culture civilizations manners and customs this Buddhist Conference earnestly requests the Government of Pakistan as well as the Government of East Bengal to declare Vaisakhi Purnima Day i.e. the Birth, Enlightenment and Great Final Decease (Maha parinibbana) Day of Lord Buddha as a Public Holiday and 10 days Special Holidays for the Buddhists as Given below:-

1) Vaisakhi Purnima: (in addition to Public Holiday to be declared).... 2 days.
2) Assini Purnima: ` The Beginning of Buddhist Lent)..... 2 days.
3) Assini Purnima: (the end of the Buddhist Lent) ..... 2 days.
4) Maghi Purnima : (Rejection of Life-term by Lord Buddha) ..... 2 days.
5) Sankranti & Mahamuni Festival: (2nd & 3rd Vaisakh in addition to puiblic Holidays) ..... 2 days.

Total Holidays 10 days

Dhaka University Institutional Repository

8. In view of the fact that the Buddhist students of the Chittagong college and of the Chittagong Collegiate School are facing immense difficulties for want of accommodation in the Chittagong Town-it is resolved that the begin Government be requested to re-open the previous Buddhist Hostels attached to the Chittagong College as well as the Chittagong Collegiate School for proper accommodation of the Buddhist Students of the said College and of the School.

9. In view of the fact that although the Buddhists of East Bengal whose ancestors held command over Bharat Sub-Continent for long ago, form an important and quite distinct Minority Community as regards their religion, culture, civilization, manners and customs, they are going totally unrepresented in both the present East Bengal Legislative Assembly as well as in the Pakistan Constituent Assembly, while other Minorities are going properly represented therin a and that the Buddhists desire that they should be adequately represented in both the Assemblies this Buddhist conference earnestly solicit the Government of Pakistan as well as the Government of East Bengal to allot seat or seats for and to nominate 1 and 4 Buddhists respectively for the present Pakistan Constituent Asemby and the East Bengal Legislative Assembly by giving weightage to them.

11. In view of the fact that the Buddhists of East Bengal form an important and distinct Minority Community as regards their religion, culture and civilization etc. this Buddhist conference request the Government of Pakistan and the Government of East Bengal as well as the authorities concerned to see, that articles and subjects dealings with all the branches of arts and sciences, viz. stories poem, parables, biographies, leterature, language, history, religion Philosophy, Archaeology, Iconography and Paleography etc. be included as the case may be, from the Canonical and Non-Canonical Pali Literature as well, in the Text Books that have been and will be prescribed for the primary, and the Secondary, Schools, the Colleges and the Post-Graduate Classes of the University or University.

Dhaka University Institutional Repository

20. In view of the fact that the Buddhists of East Bengal mainly concentrated in Chittagong, form an important and quite distinct Minority Community as regards their religion, culture, civization, manners and customs this Buddhist Conference demands separate Electorate with reservation of 4 seats in the East Bengal Provincial Legislature and 2 seats in the Pakistan Central Legislature and adequate representation in the Local self Government, such as Municipalities, District Boards, District School Boards, East Bengal Secondary Education Board and so on, on weightage basis, for safeguarding the rights and privileges of the Buddhists.

sd/- Amiya Kumar Barua

President.

সূত্রঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh national Archieves, Bundle-60, March, 1951, Proceedings. No. 404-408.

পরিশিষ্ট-৩ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রস্তাব ঃ

Extract from the Proceedings of the meeting of Executive Committee of the Chittagong Buddhist Association held in the premises of the Buddhist Monastery, Chittagong, on the 23rd May, 1952 with Rev. P.S. Vhikshu, B.A. President, in the chiar:

8. WHEREAS the East Bengal Legislative Assembly (Representation) Bill passed recently in the Constituent Assembly of Pakistan Grants interalia, representation to the Buddhists of East Bengal on the basis of separate electorate by alloting two seats in the East Bengal Legislative for 3,18.000 Buddhists of the entire province, whereunder:

Dhaka University Institutional Repository

a) It is implied that the hitherto non- regulated territory of the Chittagong Hill Tracts shall hereinafter be regulated for the purpose of the said Act;

b) The non-regulated of the Chittagong Hill Tracts has a population of 2,15,000 tribal Buddhists of Mongolian origin who are a primitive and preponderatingly illiterate people of nomadic habits widely dispersed over a wild rigion difficult of access, and who are vet totally unschooled in the art of democratic self-Government and in the exercise of franchise, both of which are absolutely beyond their conception in their present state of development where autocracy still reigns supreme:

c) The member of the aforesaid tribal Buddhists of the Hill Tracts is likely to augmented by 30, 000 Arakanese Buddhists of Mongolian origin by way of Racial affinity hailing from Barisal and Cox's Bazar subdivision of Chittagong in the regulated territory of East Bengal in the event of regularisation of the Chittagong Hill Tracts.

d) The Barua Buddhists of regulated East Bengal of Pak-Aryan origin from a racially distinct block numbering 73,000 are the most progressive, enlightened and Politically conscious among the Buddhists of the entire Province, and are also accustomed to the exercise of franchise since the introduction of self government (Reforms) in the affairs of the State, and have been in the forfront in the struggle for the cause of Buddhists in Pakistan and have also been unswerving in their loyalty to the state;

e) The Barua Buddhists of regulated East Bengal of Pak-Aryan origin have a way of life distinct from the Buddhists of Mongolian origin in manners and custom, and have no social relations with the latter;

f) The Barua Buddhists of regulated East Bengal are doomed to political extinction by sheer weight of numbers by the tribal Buddhists of the Hill tracts along, without taking into consideration of their possible reinforcement by the

Dhaka University Institutional Repository

Arakanese Buddhists from the regulated of the province in the event of regularisation of the Hill Tracts;

g) Public opinion and more specifically the Pak-Aryan Barua Buddhist opinion was neither consulted nor otherwise ascertained by the Govt. in framing the aforeasaid Bill seeking to extend franchise to the Chittagong Hill Tracts and thereby causing an unexpected and complete reversal of the circumstances under which this Association pressed for separate electorate for the Buddhist Community numbering 1,03,600 in the regulated province of East Bengal;

h) The standard has been fixed for

Chariastians at 106000 for lagislative representation
Sch. Castes at 140340 for " representation
General at 140735 for " representation
Muslims at 141345 for " representation
Buddhists at 159475 for " representation

Whereby a case of glaring injustice has been committed by denying the principles of enquity to the Buddhist minority community in whose case the standard had unjustly been raised to the hightest, higher than the majority community, and no consideration shown in respect of weightage;

It is resolved that:-

I) The Government of Pakistan be thanked for accepting the principal of separate electorate first put forward by this Association on behalf of the Buddhist community in East Bengal among the minorities of the province;

II) In the event of the regularisation of the Chittagong Hill Tracts, and with a view to avoid the inevitable chaos in the Legislative body arising out of untilled exercise of franchise, the Government of Pakistan be advised that the primitive and nomadic tribal Buddhists of the Chittagong Hill Tracts be first trained in the principles of democratic self-Government by placing them under a separate

Dhaka University Institutional Repository

constitution suited to their genious for an initial period of 10 years and treating the Hill Tracts as a separate constituency:

3) The Two seats allotted to the Buddhist community be reserved for the regulated territory of East Bengal under two constituencies as follows:-

Constituency No.1.

Chittagong sadar Subdivision A, population		35000
Noakhali,	”	300
Tipperah,	”	2000
Barisal,	”	15000
		52300

Constituency No.2.

Chittagong Sadar Subdivision B. population		20000
Chittagong Cox's Bazar	”	27000
		47000

Sd/D.S. Bhikshu,

President.

KAH/15.10

সূত্র ঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh national Archieves, Bundle-72, April, 1953, Proceedings No. 647-655.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রস্তাবঃ

No.-2954-C.

From: The Director of Public Instruction, East Bengal.

To: The president, Buddhist Association, Buddhist Monastery, Chittagong

Dated, 6th . August, 1951.

With reference to his letter no. 138/3 dated 27th June, 1951 forwarding there with copies of certain resolutions adopted in the Buddhist Conference held on the 13th May, 1950, the undersirened is directed to state as follows:-

Resolution:-3.

The question of holding the Pali Examination under a separate Association will be considered if & when the East Bengal Sanskrit Advisory Committee fails to hold the Pali Examinations.

Resolution:-5.

The claims of the suitable candidates from the Buddhist community for Scholarships will be considered when such scholarships are awarded.

Resolution :-8.

This will be considered if & when necessary proposal with facts and is received from the proper authorities.

Resolution:-11.

This Directorate has no objection to the inclusion of articles of Buddhist interest in text-books. Authors whether Buddhists or non-Buddhists are free to chose their materials for language readers within the requirements of the departmental syllabus. In history Buddhist religion and culture have already received due attention.

Sd/-M.S.Haq,

For Director of Public Instruction.

East Bengal

সূত্র ঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political Bangladesh national Archieves, Bundle-72, April, 1953, Proceedings No. 647-655.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫ ঃ পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশকৃত ফনিভূষণ বড়ুয়ার প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি ঃ

Pakistan Buddhist Association

Formerly Named

Chittagong Buddhist Association

Head office:

Badarpati Road, Chittagong.

Chittagong.

No. P.B.A./87 of 1952.

The 2th December, 1952

From

Phani Bhusan Barua, B.L.,

Vice-President, Pakistan Buddhist Association

and

Member, Advisory Committee, Pakistan Constituent Assembly,

Badarpati Road, Chittagong.

To

The Chief Secretary to the Government of East Bengal,

Eden Buildings, P.O. Ramna, Dacca.

Sir,

As desired by our organisation to address you on the subject of recruitment of Office Superintendent of different branches of Government Offices by promotions from Clerks of our Community serving in the Upper Division Clerical posts.

Dhaka University Institutional Repository

You are well aware of the fact that our Community has given it full allegiance and has unflinching faith in our benign Government which always gives its kind and sympathetic treatment to us by giving representation to our Community in all responsible Govt. Posts.

I regret to say that the post of an office superintendent is going totally unrepresented by the Buddhists. I desire and earnestly request you to kindly consider the cases of suitable candidates of our community in the recent and future vacancies.

As Chief Secretary our Community hopes better encouragement and special treatment in your hands.

Thanking you in anticipation

Yours faithfully,

(P.B. Barua)

12-12-52

সূত্র ঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh National Archieves, Home, Political, Bundle-83, Sep 1953, Proceedings No. 237.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬ ঃ সুধাংশ বিমল বড়ুয়ার চিঠি ঃ

From-

Sudhangahu Bimal Barua. M.L.A.
East Bengal Buddhist Constituency
P.O. Mahamuni, Chittagong.

To

The Hon'ble Mr. Asrafuddin Chowdhury
Minister in charge of Education.
Govt. of East Bengal.
Dacca.

Dated, Mahamuni the 8th November 1955

Sir,

I, on behalf of the Buddhist community of East Bengal beg to approach your honour on the question of representation of the Buddhist employees in the different services, particularly in the Education Department and beg to state as follows:-

That during the British rule in India the Buddhists were recognized as a significant minority community quite distinct in customs and rellgious belief and culture and civilisation and as such their causes were considered with sympathy and generosity in matters of appointment, education and the like giving them scope to make progress in all respects.

It is therefore requested that special consideration may kindly be shown to the Buddhist candidates as distinct from the Hindus, in filling up the above vacancies.

Yours obediently

Sudhangshu Bimal Barua
M. L. A.
P.O. Mahamuni. Chittagong.

সূত্র ঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh National Archieves, Home, Political, Bundle-138, May, 1957, Proceedings No. 225.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭ ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে সরকারী ছুটি ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব সম্বলিত চিঠির অংশ ঃ

Extracts from the proceeding of a meeting of the Governing Body of the Bengal Provincial Buddhist Association dated the 28th December, 1947.

3. Resolved- That the Bengal Provincial Buddhist Association feels satisfaction that the Buddha Purnima Day is now-a-days widely and enthusiastically observed as a very sacred day by the people at large in Bengal in honour of the sacred memory of Lord Buddha Who was undoubtedly a great world figure and master-mind, and who proclaimed from the soil of India the lofty and noble messages which the modern disordered world is beginning to appreciate and welcome as sure way to peace, progress and happiness, and resolves that the two Governments of West Bengal and East Bengal be earnestly requested to declare a public holiday for one day only every year on account of the Buddha Purnima Day Which in itself is an unique and Thrice-Blessed Day as it commemorates the three remarkable events in the life of Lord Buddha, namely, his Birth, Enlightenment and Demise, and which figures and a notable date in Indian History.

Sd/- D. L. Barua,

President

Memo. No. 160/47 D/- 30.12.47

সূত্র ঃ Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh National Archieves, Home, Political, Bundle-48, July 1949, Proceedings No. 292-93.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮ ঃ সংঘ কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্রের অনুলিপি ঃ

"NAMO TASSA"

Phone No. 244413

Pakistan Bouddha Kristi Prochar Sangha

(BUDDHIST CULTURAL ORGANISATION)

Regional Centre of the World Fellowship of Buddhists in Pakistan

Head Office:
BUDDHIST MONASTERY.
Kamalapur, Dacca-14,
East Pakistan.

Chittagong Office:
30/5. ANDERKILIA
Chittagong
East Pakistan.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Date .....

"This is to Certify that Miss/Mr .....

Son/Doughter/Wife of Mr./Late ..... of

Village.....P.S. ..... Dist.

Chittagong is a **Pakistani Buddhist** by Birth.

Authorities are requested to provide him help."

Sd/

Ven. Visuddhanand Mahathero, T.pk.T.K

President,

Seal.

Pakistan Bouddha Kristi Prachar Sangha,

DACCA,

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, চতুর্থ খন্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা- ৬৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯ ঃ জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের থাইল্যান্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে লেখা পত্র ঃ

"General Agha Mohammad Yahya Khan,
President of Pakistan.
Islamabad.

15th Sept. 71

Your Excellencey

We Would like to bring to your kind attention the fact there is one active Regional centre of the World Fellowship of Buddhists in Dacca as per address stipulated below which has been affiliated with our Headquarters since our organisation was founded in 1950 in Ceylon.

Assuring Your Excellency of our profound regards, we remain,

Yours in the Dhamma,

Sd/-

H.S.H. Princess Poon Pismai Diskul,
President,
World Fellowship of Buddhist.

Address: W.F.B Regional Centre.
Pakistan Bouddha Kristi Prachar Sangha
Buddhist Monastery, Kamalapur,
Dacca-2, East Pakistan.

cc. H.E. U Thant Secretary General U.N.
H.E. The Ambassador of Pakistan, Bangkok, Thailand."

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, চতুর্থ খন্ড, ১৯৮২, পৃঃ- ৬৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০ ঃ মুক্তিযুদ্ধকালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা ঃ

নাম	ঠিকানা	নিখোঁজের তারিখ
১। শ্রী সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া এম.এ.সি.এস.পি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পাকিস্তান রেলওয়ে	রাউজান, চট্টগ্রাম	২৬/০৪/৭১
২। প্রভাস কুসুম বড়ুয়া	ইছামতি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	২১/০৮/৭১
৩। চিত্ত রঞ্জন বড়ুয়া,	স্টেনো-রেলওয়ে, রাউজান, চট্টগ্রাম	২৯/০৪/৭১
৪। শ্রী সঞ্চয় ভূষণ বড়ুয়া	বন্দরের চাকুরিজীবী	২৯/০৪/৭১
৫। শ্রী তরিৎ কান্তি বড়ুয়া	টি. এন্ড. টি, রাউজান, চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম	২৯/০৪/৭১
৭। শ্রী ধর্মদর্শী বড়ুয়া,	চাকুরি-টি.এন্ড. টি.	১৯/০৪/৭১
৮। শ্রী পরাগ বড়ুয়া,	চাকুরি-টি. এন্ড.টি; সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	২৯/০৪/৭১
৯। সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া,	কর্ণফুলী পেপার মিল, চন্দ্রঘোনা, চাকুরি-পটিয়া, চট্টগ্রাম	২৯/০৪/৭১
১০। শ্রী হীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া,	চাকুরি-কে.পি.এম. চন্দঘোনা, চট্টগ্রাম	১৪/০৪/৭১
১১। শ্রী সত্য রঞ্জন বড়ুয়া	মোটর ওয়ার্কসপ, চন্দনপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৬/০৪/৭১
১২। শ্রী ভবেশচন্দ্র বড়ুয়া,	চাকুরি-বন্দর, জানারখীল, ফটিকছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৬/০৪/৭১
১৩। শ্রী নিপুল কান্তি বড়ুয়া	চকবাজার (ইলিসিয়াম বিল্ডিং)	০৩/০৫/৭১
১৪। শ্রী সুবিমল বড়ুয়া, চাকুরি,	টি.এন্ড.টি.	২৯/০৪/৭১
১৫। বংগীশ বড়ুয়া, সহকারী	প্রধান শিক্ষক কাপ্তাই সরকারী হাইস্কুল, চট্টগ্রাম	১৪/০৭/৭১

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র,চতুর্থ খন্ড, ১৯৭২, পৃঃ- ৬৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১ ঃ ১৯৭১ সালে আরও যাঁরা নিখোঁজ হয় এবং পরবর্তীতে নিহত হয় তাঁদের নামও ঠিকানা ঃ-

	নাম	ঠিকানা	নিখোঁজের তারিখ
১।	শ্রী সঞ্জয়ন বড়ুয়া,	চাকুরি-টি. এন্ড.টি, রাউজান, চট্টগ্রাম	২১/০৪/৭১
২।	শ্রী অনিল কান্তি বড়ুয়া	ঠিকানা জানা যায়নি	কার্তিক, ৭৮ বাংলা
৩।	শ্রী রেবতী বড়ুয়া	ঠিকানা জানা যায়নি	বৈশাখ, ৭৮ বাংলা
৪।	সুনীল মুৎসুদ্দী,	রাঙ্গামাটি থানা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক	
৫।	শ্রী বিধূভূষণ বড়ুয়া	মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	২০/০৭/৭১
৬।	শ্রী সুভাষ বড়ুয়া	ঐ	২০/০৭/৭১
৭।	শ্রী রমেশচন্দ্র বড়ুয়া	ঐ	১৮/০৫/৭১
৮।	শ্রী বঙ্কিম বড়ুয়া	ঐ	১৮/০৫/৭১
৯।	শ্রী মৃণাল বড়ুয়া,	দমদমা মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম	০৯/০৭/৭১
১০।	শ্রী নীলকমল বড়ুয়া,	কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	১৬/০৮/৭১
১১।	শ্রী ভূপেন্দ্র লাল বড়ুয়া,	চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম	
১২।	শ্রী সমীরণ বড়ুয়া,	পান্থশালা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম	১৮/০৮/৭১
১৩।	শ্রী ননীগোপাল বড়ুয়া, এম. এ	লাখেরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	
১৪।	শ্রী সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম	
১৫।	শ্রী তপন বড়ুয়া	ঐ	
১৬।	শ্রী মনিন্দ্রলাল বড়ুয়া (মণি)	ঐ	
১৭।	শ্রী সঞ্জয় ভূষণ বড়ুয়া	বন্দরের চাকুরিজীবী	২৯/০৪/৭১
১৮।	শ্রী হীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	ঐ	১৪/০৪/৭১
১৯।	শ্রী এস.আর বড়ুয়া	ঐ	
২০।	শ্রী.বি.এস. বড়ুয়া	ঐ	
২১।	শ্রী ডি.পি. বড়ুয়া	ঐ	
২২।	শ্রী হিমাংশু বড়ুয়া	বরমা চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	৩০/০৬/৭১

সূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র,চতুর্থ খন্ড, ১৯৭২, পৃঃ- ৬৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২ ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা ঃ

১। দীপক বড়ুয়া, উখিয়া, কক্সবাজার চট্টগ্রাম শহরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে পাকসেনার গুলিতে তিনি নিহত হন। একান্তরে চট্টগ্রামে প্রথম শহীদ।

২। পঙ্কজ বড়ুয়া, হিংগলা, রাউজান, চট্টগ্রাম। ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর মোহাম্মদিয়া আমীর হাটে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

৩। শুক্লধর বড়ুয়া, দমদমা, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। যুদ্ধে শহীদ হন।

৪। মৃণাল বড়ুয়া, জোরালগঞ্জ, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। পুলিশ বাহিনীতে চাকুরি করতো। শত্রু সৈন্যের মোকাবেলার সময় তিনি শহীদ হন।

৫। আনন্দ কুসুম বড়ুয়া, পারুয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন।

৬। দুলাল বড়ুয়া, হিংগাল, রাউজান, চট্টগ্রাম। ১৯৭১ সালের ১৮ অক্টোবর রাজাকারের গুলিতে নিহত হন।

৭। ঝন্টু বড়ুয়া, আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম। মুক্তিবাহিনীর খবর আদান-প্রদান করতো। ফেনীতে তিনি শহীদহ হন।

৮। আনন্দ প্রসাদ বড়ুয়া, আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম প্রশিক্ষণে যাওয়ার সময় পাকসৈন্যের গুলিতে শহীদ হন।

৯। মনোরঞ্জন সিংহ, আলীশ্বর, লাকসাম, কুমিল্লা।

১০। চারুবালা বড়ুয়া, আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম শহরে পাকসেনার গুলিতে তিনি নিহত হন।

১১। রমেশচন্দ্র বড়ুয়া, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম। পাকসেনা অথবা রাজাকার দ্বারা নিহত হন।

১২। উমেশচন্দ্র বড়ুয়া, ঐ ঐ

১৩। সারদা বড়ুয়া, ঐ ঐ

১৪। অনিল বড়ুয়া, ডাবুয়া, রাউজান চট্টগ্রাম। পাকসেনা অথবা রাজাকার দ্বারা নিহত হন।

১৫। সুকোমল বড়ুয়া, (শিক্ষক), রাঙ্গামাটি।

১৬। বুদ্ধকিঙ্কর বড়ুয়া, দমদমা, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। ঐ

১৭। সুধীর বড়ুয়া, আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম। (ইলেক্ট্রিশিয়ান, কেপিএম) ঐ

১৮। বীরবাহু বড়ুয়া (প্রধান শিক্ষক), করল ডেংগা, পটিয়া, চট্টগ্রাম ঐ

১৯। সুমতি বড়ুয়া (শিবক), শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি নিহত হন।

২০। রমেশচন্দ্র বড়ুয়া, শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ২০ শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে তিনি নিহত হন।

২১। সুনীল বড়ুয়া, (ড্রাইভার), বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। ঐ

২২। বিভূতি বড়ুয়া, বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

২৩। বিজয় রতন বড়ুয়া, দমদমা, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ঐ

২৪। মনোহরী বড়ুয়া, মায়ানী, ঐ ঐ

২৫। রাম বিহারী বড়ুয়া ঐ ঐ

২৬। যোগেশচন্দ্র বড়ুয়া ঐ ঐ

২৭। সুধাংশু বড়ুয়া ঐ ঐ

২৮। নইদাবাসী বড়ুয়া ঐ ঐ

২৯। বেনী মাধব বড়ুয়া, জোবরা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ঐ

৩০। মহীন্দ্র লাল বড়ুয়া, রুমখাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার ঐ

(পাহাড়ের পাদদেশে হত্যা করা হয়)

৩১। দেবশোক বড়ুয়া, আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম ঐ

৩২। মিলন বড়ুয়া, মোগলটুলী, চট্টগ্রাম মহানগরী ঐ

(তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য মোগলটুলীতে শহীদ মিলনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)

৩৩। নীরদ বড়ুয়া, পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম ঐ

৩৪। ধূর্জটি বড়ুয়া, শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম
(বুদ্ধমূর্তির সামনে হত্যা করা হয়)

৩৫। ভট্ট বড়ুয়া, উখিয়া, কক্সবাজার, হাত পা বেঁধে হত্যা করা হয়।

৩৬। রূপায়ণ বড়ুয়া, নোয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম ঐ
(এই আট বছরের শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়)

৩৭। শ্রী জ্ঞানেন্দ্র বড়ুয়া, সদরঘাট, রাউজান, চট্টগ্রাম ঐ
(ইনি ছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ)

৩৮। শ্রী জীবন বড়ুয়া, কৌশল্যার বাগ, কোমলগঞ্জ, নোয়াখালী ঐ

৩৯। শ্রী টুনু বড়ুয়া ঐ

৪০। শ্রী বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া এ
(ঢাকায় রাজারবাগে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন)

৪১। শ্রী দীপক বড়ুয়া, আবদুলাহপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম যুদ্ধে শহীদ হন।
(তার স্মৃতি রক্ষার্থে আবদুলাহপুরে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)

৪২। শ্রী কামিনী বড়ুয়া, রামু, কক্সবাজার।

৪৩। শ্রী সুধাংশু বড়ুয়া, হাইদচক্ষ্যা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সূত্র ঃ বোধন, প্রথম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-সলিল বিহারী বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পৃঃ-১৭-১৮,২৫১০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩ ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের নাম ঃ

১। শ্রী আনন্দ বিকাশ বড়ুয়া (স্কুল ছাত্র) ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, ক্যাপ্টেন সুন্দর সিং গুলিয়া ও লেঃ কর্ণেল আর.কে. কুমারের অধীনে বেশির ভাগ অপারেশন সিলেটে চালিয়েছেন।

২। শ্রী নৃপেন্দ্র লাল বড়ুয়া (চাকুরি, পুলিশ বিভাগ) লাঠিছড়ি, রাউজান চট্টগ্রাম, সম্মুখযোদ্ধা, অপারেশন এলাকা সোনাগাজী, নোয়াখালী ও মীরেরসরাই।

৩। শ্রী অনিল বড়ুয়া (চাকুরি, পুলিশ বিভাগ)। সম্মুখযোদ্ধা ডাবুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৪। শ্রী জিনুঞ্জন বড়ুয়া, বি.এস. সি. বাগোয়ান, চট্টগ্রাম। গ্রুপ কমান্ডার। প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন করিম। মিত্রবাহিনীর সাথে সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন এবং অপারেশন এলাকা ছিল পদুয়া, রাঙ্গুনিয়া, শিলক।

৫। শ্রী বোধিপাল বড়ুয়া (চাকুরি, পুলিশ বিভাগ। আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম। ফেনী বর্ডারে অপারেশন চালায়।

৬। শ্রী সুকুমার বড়ুয়া। আবুতরব, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। ১নং সেক্টর প্লাটুন কমান্ডার, এস, এম শরফুদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করেন।

৭। শ্রী বীরসিন্দু বড়ুয়া। দমদমা, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। সম্মুখযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট রফিকের সাথে যুদ্ধ করেন।

৮। শ্রী বীরসিন্দু বড়ুয়া। মায়ানী, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম। ই.পি.আর এর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

৯। শ্রী নীতিশ বড়ুয়া। আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম। ইস্টার্ন সেক্টরে মুজিব বাহিনীর প্রধান শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন।

১০। শ্রী ফনীন্দ্র লাল বড়ুয়া, সুরঙ্গা, রাউজান, চট্টগ্রাম মিত্রবাহিনীর সাথে সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মেজর হোবহান।

১১। শ্রী সুনীল বড়ুয়া, সম্মুখযোদ্ধা, সুরঙ্গা, রাউজান, চট্টগ্রাম। তত্ত্বাবধায়ক মেজর হোবহান।

১২। শ্রী বিপতি বড়ুয়া, ঐ ঐ

১৩। স্বপন বড়ুয়া, হিঙ্গলা, রাউজান, চট্টগ্রাম ঐ

১৪। শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া ঐ ঐ

১৫। শ্রী সন্তোষ বড়ুয়া (সম্মুখযোদ্ধা) ঐ ঐ

১৬। শ্রী সুজন বড়ুয়া, বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। মিত্রবাহিনীর সাথে সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন।

১৭। শ্রী বাবুল বড়ুয়া, (স্কুল ছাত্র), জোবরা, মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৮। শ্রী ভবেশ বড়ুয়া, দমদমা মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ঐ

১৯। শ্রী মতিলাল বড়ুয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। সিলেট পুলিশ বিভাগে চাকুরি করেছেন। পাক বাহিনীর সাথে অনেক স্থানে যুদ্ধ করেন।

২০। শ্রী সুঙ্গল বড়ুয়া, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম। সেক্টর কমান্ডার হাসেমের সাথে যুদ্ধ করেন।

২১। শ্রী অনিলকুমার বড়ুয়া, ডাবুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম। পুলিশ বিভাগে চাকুরি করতেন। সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন।

২২। শ্রী সুনীল বড়ুয়া, কদলপুর-এ রাজাকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

২৩। শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া, শ্রীপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। ব্যাংক কর্মচারী। মিত্রবাহিনীর সাথে ছিলেন।

২৪। শ্রী অজিত বড়ুয়া, (ছাত্র) শিলক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। শেখ মনির সাথে মুজিব বাহিনীতে ছিলেন।

২৫। শ্রী মদন বড়ুয়া, পদুয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

২৬। শ্রী অমিয় বড়ুয়া, ঐ, প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন।

২৭। শ্রী বিপুল বড়ুয়া, আবদুল্লাহপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। কমান্ডার ছিলেন।

২৮। শ্রী অনুজ বড়ুয়া, হাইদচক্ষ্যা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। দলনেতা ছিলেন।

২৯। শ্রী সম্বোধি প্রসাদ বড়ুয়া, আবদুল্লাহপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। কমান্ডার ছিলেন।

৩০। শ্রী সতিনকুমার বড়ুয়া, সাতকানিয়া (সিপাহী)। সম্মুখযোদ্ধা।

৩১। শ্রী সুরক্ষিত বড়ুয়া, (ছাত্র) উখিয়া কক্সবাজার। সহ-অধিনায়ক ছিলেন।

৩২। শ্রী পরেশ বড়ুয়া, রামু, কক্সবাজার, সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন।

৩৩। শ্রী প্রভাকর বড়ুয়া, বীনাজুরি, রাউজান, চট্টগ্রাম। এফ. এফ কমান্ডার।

৩৪। শ্রী বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, খৈয়াখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম। ১নং সেক্টরে ছিলেন

৩৫। শ্রী ভারত বড়ুয়া, কোটের পাড়, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন।

সূত্র ঃ বোধন, প্রথম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-সলিল বিহারী বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পৃঃ-১৮-১৯, ২৫১০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৪ ঃ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নামঃ

জেলা চট্টগ্রাম ঃ

থানা রাউজান, গ্রাম-আবুরখীল

১। শ্রী তেমিয় মুৎসুদ্দী

২। শ্রী সলিল বিকাশ বড়ুয়া

৩। শ্রী পবন তালুকদার

৪। শ্রী দিলীপ বড়ুয়া

৫। শ্রী বীরমোহন বড়ুয়া, প্রকৌশলী

৬। শ্রী আনন্দ বড়ুয়া

৭। শ্রী প্রবীর বড়ুয়া

৮। শ্রী কনিষ্ঠকুমার বড়ুয়া

৯। শ্রী মৃদুল কান্তি বড়ুয়া

১০। শ্রী শিবু বড়ুয়া

১১। শ্রী প্রধীর বড়ুয়া

১২। রুপেন্দু বড়ুয়া, বি. এস.সি

১৩। শ্রী গুনেশ বড়ুয়া

১৪। শ্রী বিদ্যুৎকুমার বড়ুয়া

থানা রাউজান, গ্রাম-গহিরা

১৫। শ্রী আশুতোষ বড়ুয়া

১৬। শ্রী সুমঙ্গল বড়ুয়া

থানা রাউজান,গ্রাম-রাউজান

১৭। শ্রী সুকুমার বড়ুয়া

১৮। শ্রী সন্তোষ বড়ুয়া

২৪। শ্রী মৃদুল বড়ুয়া

থানা রাউজান, গ্রাম-বীনাজুরি

২৫। শ্রী দুদুল বড়ুয়া

থানা রাউজান, গ্রাম- হিংগলা

২৬। শ্রী সন্তোষ বড়ুয়া

২৭। শ্রী খোকন বড়ুয়া

২৮। শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া

থানা-রাউজান, গ্রাম-মহামুনি, পাহাড়তলী

২৯। শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া (সঙ্গীতাচার্য)

৩০। শ্রী শৈবাল বড়ুয়া

৩১। শ্রী রতন বড়ুয়া

৩২। শ্রী রবি বড়ুয়া

৩৩। শ্রী আশীষ চৌধুরী

৩৪। শ্রী চিত্ত বড়ুয়া

৩৫। শ্রী নিরূপম তালুকদার

৩৬। শ্রী সুশীল বড়ুয়া

৩৭। শ্রী সুদত্ত বড়ুয়া

৩৮। শ্রী প্রকৃতি রঞ্জন বড়ুয়া

৩৯। শ্রী সুশান্তি বড়ুয়

৪০। শ্রী পঞ্চানন বড়ুয়া

৪১। শ্রী মিলন বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৯। শ্রী অরিন্দম বড়ুয়া

থানা রাউজান,গ্রাম-ডাবুয়া

২০। শ্রী বিমল বড়ুয়া

২১। শ্রী খগেন্দ্র বড়ুয়া

২২। শ্রী অরুণ বড়ুয়া

২৩। শ্রী প্রিয়তোষ বড়ুয়া

থানা- রাউজান, গ্রাম- গহিরা

৪৬। শ্রী নিরঞ্জন বড়ুয়া

থানা- রাউজান, গ্রাম- লাঠিছড়ি

৪৭। শ্রী স্বপন বড়ুয়া

থানা- রাউজান, গ্রাম-নোয়াপাড়া

৪৮। শ্রী কল্যাণমিত্র বড়ুয়া

৪৯। শ্রী সুভাষ বড়ুয়া

থানা-রাউজান, গ্রাম-আধারমানিক

৫০। শ্রী কল্যাণমিত্র বড়ুয়া

৫১। শ্রী শুভানন বড়ুয়া

৫২। শ্রী আশুতোষ বড়ুয়া

৫৩। শ্রী মহিতোষ বড়ুয়া বি.এস.সি.

থানা-রাউজান, গ্রাম- হোয়ারাপাড়া

৫৪। শ্রী স্বপন কান্তি বড়ুয়া

৫৫। শ্রী বিকাশ বড়ুয়া

৫৬। শ্রী মুকুলেশ বড়ুয়া

৫৭। শ্রী চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া

৪২। শ্রী দিলীপ বড়ুয়া

৪৩। শ্রী চিত্ত বড়ুয়া

থানা রাউজান, গ্রাম-ইদিলপুর

৪৪। শ্রী উদয়ন বড়ুয়া

৪৫। শ্রী সুবল বড়ুয়া

৬৯। শ্রী স্বপন বড়ুয়া

৭০। শ্রী অধীরচন্দ্র বড়ুয়া

৭১। শ্রী মিলন বড়ুয়া

৭২। শ্রী অনিমেষ বড়ুয়া

থানা-রাউজান, গ্রাম-দক্ষিণ জয়নগর

৭৩। শ্রী মৃণাল কান্তি বড়ুয়া

থানা- রাউজান, গ্রাম- কদলপুর

৭৪। শ্রী সুনীল বড়ুয়া

থানা- রাউজান ,গ্রাম-পাঁচখাইন

৭৫। শ্রী মনোজ বড়ুয়া

৭৬। শ্রী আশুতোষ বড়ুয়া

৭৭। শ্রী সুকুমার বড়ুয়া

৭৮। শ্রী রতন বড়ুয়া

৭৯। শ্রী গৌতম বড়ুয়া

৮০। শ্রী স্মৃতিকণা বড়ুয়া

থানা-রাউজান, গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়নি

৮১। শ্রী আলোজ্যোতি বড়ুয়া

৮২। শ্রী সুনীল বড়ুয়া

থানাঃ রাঙ্গুনিয়া, গ্রামঃ বেতাগী

Dhaka University Institutional Repository

৫৮। শ্রী সাধন বড়ুয়া

৫৯। শ্রী নরেশচন্দ্র বড়ুয়া

৬০। শ্রী রবীন্দ্রলাল বড়ুয়া

৬১। শ্রী মানিক বড়ুয়া

৬২। শ্রী শ্যামল বড়ুয়া

৬৪। শ্রী সুনীল বড়ুয়া

৬৫। শ্রী তাপস বড়ুয়া (বি.এ.বি.এড)

৬৬। শ্রী প্রিয়তম বড়ুয়া

৬৭। শ্রী আশুতোষ বড়ুয়া

৬৮। শ্রী তেজেন্দ্র লাল বড়ুয়া

৯৩। শ্রী ধনাঢ্য বড়ুয়া

থানা-রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম-ইছামতি

৯৪। শ্রী দ্বৈপায়ন বড়ুয়া

৯৫। শ্রী কাজল বড়ুয়া

৯৬। শ্রী শিবু বড়ুয়া

৯৭। শ্রী অমিত বড়ুয়া

৯৮। শ্রী বাদল বড়ুয়া

৯৯। শ্রী সুজন বড়ুয়া

১০০। শ্রী পরিমল বড়ুয়া

১০১। শ্রী সুশান্ত বড়ুয়া

১০২। শ্রী অটল বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- নজরেরটিলা

১০৩। শ্রী শংকর মুৎসুদ্দী

১০৪। শ্রী নন্দন বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- ঘাটচেক

৮৩। শ্রী সুজন বড়ুয়া

৮৪। শ্রী চাণক্য বড়ুয়া

৮৫। শ্রী কংকন বড়ুয়া

৮৬। শ্রী সুকান্ত বড়ুয়া

৮৭। শ্রী শংকর বড়ুয়া

৮৮। শ্রী মানিক বড়ুয়া

৮৯। শ্রী বোধিসত্ব বড়ুয়া

৯০। শ্রী সুধীন্দ্র বড়ুয়া

৯১। শ্রী মানবেন্দ্র বড়ুয়া

৯২। শ্রী চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া

১১৫। শ্রী রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া

১১৬। শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া

১১৭। শ্রী লোইন বড়ুয়া

১১৮। শ্রী বিপ্লব বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- সুখবিলাস

১১৯। শ্রী তেমিয়কুমার তালুকদার

১২০। শ্রী সুখলাল বড়ুয়া

১২১। শ্রী সুদত্ত বড়ুয়া

১২২। শ্রী নিধু বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- পদুয়া

১২৩। শ্রী কল্যাণমিত্র বড়ুয়া

১২৪। শ্রী অনিল বড়ুয়া

১২৫। শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া

১২৬। শ্রী স্বপন বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- ফলাহারিয়া

Dhaka University Institutional Repository

১০৫। শ্রী সত্যপ্রিয় বড়ুয়া

১০৬। শ্রী প্রমোদ বড়ুয়া

১০৭। শ্রী জিনপদ বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- পাঠ্যালিকুল

১০৮। শ্রী অনূপ বড়ুয়া

১০৯। শ্রী সজল বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- মরিয়মনগর

১১০। শ্রী সুধন বড়ুয়া

১১১। শ্রী রাজু বড়ুয়া

১১২। শ্রী সুদত্ত বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- পারুয়া

১১৩। শ্রী কেপু বড়ুয়া

১১৪। শ্রী আনন্দ কুসুম বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- পোমরা

১২৭। শ্রী মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া

থানা- রাঙ্গুনিয়া, গ্রাম- শিলক

১২৮। শ্রী রণজিতকুমার বড়ুয়া, বি.এস.সি

থানাঃ হাটহাজারী,

১২৯। শ্রী সুশান্ত বড়ুয়া, ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন

১৩০। শ্রী অজয় বড়ুয়া, এম. এ. গুমানমর্দন

১৩১। শ্রী বাদল কান্তি বড়ুয়া

থানা- ফটিকছড়ি, গ্রাম- আব্দুল্লাহপুর

১৩২। শ্রী বনকুসুম বড়ুয়া

১৩৩। শ্রী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

১৩৪। শ্রী সাধনচন্দ্র বড়ুয়া

১৩৫। শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া

১৩৬। শ্রী রণজিতকুমার বড়ুয়া

১৩৭। শ্রী জ্যোতিপাল বড়ুয়া

১৩৮। শ্রী বাবুল চৌধুরী

১৩৯। শ্রী অলক বড়ুয়া

১৪০। শ্রী পরিমল বড়ুয়া

১৪১। শ্রী বাবুল বড়ুয়া

১৪২। শ্রী সঞ্জীব বড়ুয়া

১৪৩। শ্রী খোকন কান্তি বড়ুয়া

১৪৪। শ্রী সুধাংশু বড়ুয়া

১৪৫। শ্রী করুণা বড়ুয়া (ফিরিংগিরখিল)

১৪৬। শ্রী চাঁন্দু বড়ুয়া

থানা- ফটিকছড়ি, গ্রাম- কোটেরপাড়

১৬৩। শ্রী সুশীল বড়ুয়া

১৬৪। শ্রী অলকেশ বড়ুয়া

১৬৫। শ্রী সন্তোষ বড়ুয়া

১৬৬। শ্রী নিরূপম বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- হাজারীরচর

১৬৭। শ্রী শরণ বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- কধুরখীল

১৬৮। শ্রী অর্ধেন্দু বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- জৈষ্ঠ্যপুরা

Dhaka University Institutional Repository

১৪৭। শ্রী অমলেন্দু বড়ুয়া

১৪৮। শ্রী অশোক বড়ুয়া

১৪৯। শ্রী মিতুল বড়ুয়া

১৫০। শ্রী প্রিয়দর্শী বড়ুয়া

১৫১। শ্রী মেইঙ্গা

থানা- ফটিকছড়ি, গ্রাম- নানুপুর

১৫২। শ্রী সমীর বড়ুয়া

১৫৩। শ্রী তুষার বড়ুয়া

১৫৪। শ্রী বাবুল বড়ুয়া

থানা- ফটিকছড়ি, গ্রাম- জানা যায়নি

১৫৫। শ্রী নেপাল বড়ুয়া

১৫৬। শ্রী নাথুরাম বড়ুয়া

১৫৭। শ্রী নরেশ বড়ুয়া

১৫৮। শ্রী প্রজেশ বড়ুয়া

১৫৯। শ্রী প্রকাশ বড়ুয়া

থানা- ফটিকছড়ি, গ্রাম- পাইন্দং

১৬০। শ্রী সুশীল বড়ুয়া

থানাঃ ফটিকছড়ি, গ্রামঃ হাইদচক্ষ্যা

১৬১। শ্রী অনুজ বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- শাকপুরা

১৬২। শ্রী দুকুল বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- উনাইনপুরা

১৬৫। শ্রী প্রিয়দর্শী বড়ুয়া

১৬৬। শ্রী মনোজ বড়ুয়া

১৬৭। শ্রী রাজিব বড়ুয়া

১৬৮। শ্রী মৃণাল বড়ুয়া

১৬৯। শ্রী খোকা বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- বৈদ্যপাড়া

১৭০। শ্রী অমল বড়ুয়া (লাতু)

১৭১। শ্রী সুকুমার বড়ুয়া চৌধুরী (বাবুল)

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- শ্রীপুর

১৭২। শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া

থানা- বোয়ালখালী, গ্রাম- সারোয়াতলী

১৭৩। শ্রী বিন্দু বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- পিংগলা

১৭৪। শ্রী শচীন্দ্র লাল বড়ুয়া

১৭৫। শ্রী তেমিয় চৌধুরী

১৭৬। শ্রী মিলন বড়ুয়া

১৭৭। শ্রী দুলাল বড়ুয়া

১৭৮। শ্রী অর্ধেন্দু বড়ুয়া

১৭৯। শ্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- পাঁচড়িয়া

১৮০। শ্রী মুক্তিমান বড়ুয়া বি.এ,

১৮১। শ্রী কনক বড়ুয়া

১৮২। শ্রী সুমেধ বড়ুয়া

১৮৩। শ্রী রতন বড়ুয়া

১৮৪। শ্রী মনোজ বড়ুয়া

২০৮। শ্রী সুরক্ষিত বড়ুয়া

২০৯। শ্রী সুজিত বড়ুয়া

২১০। শ্রী প্রিয়তোষ বড়ুয়া

২১১। শ্রী সু-বড়ুয়া

২১২। শ্রী রাজিব বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯। শ্রী রতন বড়ুয়া

১৯০। শ্রী ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়া

১৯১। শ্রী অমল বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- করল ডেঙ্গা

১৯২। শ্রী মৃণাল বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- তেকোটা

১৯৩। শ্রী সুজিত বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- বুধপাড়া

১৯৪। শ্রী অমিয় কুমার বড়ুয়া

১৯৫। শ্রী অনিল কুমার বড়ুয়া

১৯৬। শ্রী মিলন কান্তি বড়ুয়া

১৯৭। শ্রী রাজমোহন বড়ুয়া

১৯৮। শ্রী দুলাল কান্তি বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- হুলাইন

১৯৯। শ্রী মানবেন্দ্র বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- ঠেগরপুনি

২০০। শ্রী তাপস বড়ুয়া

থানা- পটিয়া, গ্রাম- জানা যায়নি

২০১। শ্রী সাধন বড়ুয়া

২০২। শ্রী পরেশ বড়ুয়া

২০৩। শ্রী অমিয় বড়ুয়া

২০৪। শ্রী অনিল বড়ুয়া

২০৫। শ্রী মিলন বড়ুয়া

২০৬। শ্রী দুলাল বড়ুয়া

২০৭। শ্রী রাজ মোহন বড়ুয়া

থানা- রামু, গ্রাম- রামু

২৩১। শ্রী ধীমান বড়ুয়া

২৩২ শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ বড়ুয়া

২১৩।শ্রী রতন বড়ুয়া

২১৪।শ্রী সুনীল বড়ুয়া

থানা- চন্দনাইশ, গ্রাম- জামিজুরী

২১৫।শ্রী অনিল বড়ুয়া

২১৬।শ্রী সাধন বড়ুয়া

২১৭।শ্রী মানিক বড়ুয়া

২১৮। শ্রী মৃণাল বড়ুয়া

থানাঃ সাতকানিয়া, গ্রামঃ চেমশা

২১৯। শ্রী প্রবীণ কান্তি বড়ুয়া

২২০। শ্রী সাধন কান্তি বড়ুয়া

২২১। শ্রী রাজবিহারী বড়ুয়া

২২২। শ্রী সুকুমার বড়ুয়া

থানা- সাতকানিয়া, গ্রাম- শীলঘাটা

২২৩। শ্রী ধর্মদর্শী বড়ুয়া

২২৪। শ্রী অনিল বড়ুয়া

২২৫। শ্রী মিলন বড়ুয়া

থানা- লোহাগড়া, গ্রাম- উত্তর পুরানগর

২২৬। শ্রী প্রবীন্দ্র লাল বড়ুয়া

থানা- লোহাগড়া, গ্রাম- বড়হাতিয়া

২২৭। শ্রী মিলন বড়ুয়

কক্সবাজার জেলা

থানা- উখিয়া, গ্রাম- উখিয়া

২২৮। শ্রী জয়সেন বড়ুয়া

২২৯। শ্রী সুনীল বড়ুয়া

২৩০। শ্রী পরিমল বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

২৩৩। শ্রী অরবিন্দ বড়ুয়া

২৩৪। শ্রী উদয়ন বড়ুয়া

২৩৫। শ্রী মিলন বড়ুয়া

২৩৬। শ্রী দিলীপ বড়ুয়া

২৩৭। শ্রী রমেশ বড়ুয়া

২৩৮। শ্রী আশীষ বড়ুয়া

২৩৯। শ্রী খোকা বড়ুয়া

বান্দরবন

২৪০। শ্রী প্রিয়তোষ বড়ুয়া

রামগড়

২৪১। শ্রী মাখন বড়ুয়া

২৪২। শ্রী ধীমান বড়ুয়া

থানা- সীতাকুন্ড, গ্রাম- পান্থশালা

২৪৩। শ্রী অনিল বড়ুয়া

থানা- মীরেরসরাই, গ্রাম- দমদমা

২৪৪। শ্রী কনক বড়ুয়া

২৪৫। শ্রী মানিক বড়ুয়া

২৪৬। শ্রী সুমেধ বড়ুয়া

থানা- বেগমগঞ্জ, গ্রাম- নোয়াখালী

২৪৭। শ্রী মিলন বড়ুয়া

২৪৮। শ্রী রণজিত বড়ুয়া (রঞ্জু)

লাকসাম- কুমিলা

২৪৯। শ্রী রণজিত সিংহ

থানা- বাঁশখালী

২৫০। শ্রী প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া

সূত্র ঃ বোধন, প্রথম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-সলিল বিহারী বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পৃঃ-২০-২৯, ২৫১০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৫ ঃ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অবদানঃ

১।	শ্রী নীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	ন্যাপ নেতা	সীতাকুন্ড থানা
২।	শ্রী মিলন বড়ুয়া	ঐ	রাউজান
৩।	শ্রী প্রফুল কুমার বড়ুয়া	ঐ	ঐ
৪।	শ্রী মিলন প্রভাস বড়ুয়া (প্রধান শিক্ষক)	ঐ	রাঙ্গুনিয়া থানা
৫।	শ্রী সত্যাপ্রসন্ন বড়ুয়া বি. এ	ঐ	রাউজান থানা
৬।	শ্রী রূপালী বড়ুয়া	আওয়ামী লীগ	হাটহাজারী থানা
৭।	শ্রী নেপাল মুৎসুদ্দী	ঐ	ঐ
৮।	শ্রী সুবেশচন্দ্র বড়ুয়া	ঐ	বোয়ালখালী থানা
৯।	শ্রী মৃণাল কান্তি বড়ুয়া	ঐ	পটিয়া থানা
১০।	শ্রী অমল কান্তি বড়ুয়া	ঐ	কোতোয়ালী থানা
১১।	শ্রী বঙ্কিম বড়ুয়া	ঐ	রাউজান থানা
১২।	শ্রী অরুণ কুমার বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৩।	শ্রী হিমাংশু বিমল বড়ুয়া (উকিল)	ঐ	রাঙ্গুনিয়া থানা
১৪।	শ্রী মোহন বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৫।	শ্রী অনিল বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৬।	শ্রী সঞ্জীবকুমার বড়ুয়া (উকিল)	ঐ	মীরেরসরাই থানা
১৭।	শ্রী কেশব বড়ুয়া	কমিউনিস্ট পার্টি	রাঙ্গুনিয়া
১৮।	শ্রী অতুলচন্দ্র বড়ুয়া	সংগ্রেস কর্মী	মীরেরসরাই থানা

বি. দ্রঃ শ্রী মিলন প্রভাস বড়ুয়া এবং শ্রী সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন।

১।	শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ বড়ুয়া	ছাত্রলীগ নেতা	কক্সবাজার
২।	শ্রী দুলাল বড়ুয়া	ঐ	হাটহাজারী থানা
৩।	শ্রী মৃদুল বড়ুয়া	ঐ	ঐ
৪।	শ্রী প্রভাস বড়ুয়া	ঐ	পটিয়া থানা
৫।	শ্রী সীসন	ঐ	রাউজান থানা

Dhaka University Institutional Repository

৬।	শ্রী রাজু বড়ুয়া	ঐ	রাঙ্গুনিয়া
৭।	শ্রী সুকান্ত	ঐ	রাঙামাটি
৮।	শ্রী সুব্রত বড়ুয়া	ঐ	ঐ
৯।	শ্রী আনন্দ বড়ুয়া	বাংলা ছাত্রলীগ	
১০।	শ্রী সৌমিত্র বড়ুয়া	ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী	বোয়ালখালী থানা
১১।	শ্রী মুক্তিমান বড়ুয়া	ঐ	পটিয়া থানা
১২।	শ্রী সুব্রত বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৩।	শ্রী সংঘপ্রিয় বড়ুয়া	ঐ	রাউজান থানা
১৪।	শ্রী আনন্দ বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৫।	শ্রী অংশুমান বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৬।	শ্রী প্রফুল বড়ুয়া	ঐ	ঐ
১৭।	শ্রী সুভাষ বড়ুয়া	ঐ	রাঙামাটি থানা
১৮।	শ্রী সুরক্ষিত বড়ুয়া	ঐ	উখিয়া থানা
১৯।	শ্রী ডি. এল. বড়ুয়া	ঐ	চন্দ্রঘোনা
২০।	শ্রী বিপ্রদাশ বড়ুয়া	ঐ	রাঙ্গুনিয়া
২১।	শ্রী সুব্রত বড়ুয়া	ঐ	ফটিকছড়ি
২২।	শ্রী শীলব্রত তালুকদার	ঐ	পটিয়া
২৩।	শ্রী শীলব্রত বড়ুয়া	ঐ	রাউজান
২৪।	শ্রী উদয়ন বড়ুয়া	ঐ	
২৫।	শ্রী অনিল বড়ুয়া	ঐ	
২৬।	শ্রী প্রবীর বড়ুয়া	ঐ	
২৭।	শ্রী দীপেন্দ্র লাল বড়ুয়া	ঐ	রাউজান থানা
২৮।	শ্রী পরিমল বড়ুয়া	ঐ	রাঙ্গুনিয়া
২৯।	শ্রী দেবপ্রিয় বড়ুয়া	ঐ	

সূত্র ঃ বোধন, প্রথম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-সলিল বিহারী বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পৃঃ-২৯-৩২, ২৫১০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৬ ঃ যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান করে যারা মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অবদান রেখেছেন ঃ

১।	শ্রী পুলীন বিহারী বড়ুয়া	আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম
২।	শ্রী ইন্দুভূষণ বড়ুয়া	ঐ
৩।	শ্রী প্রফুল্ল কমল বড়ুয়া	ঐ
৪।	শ্রী বিভূতিভূষণ বড়ুয়া	ঐ
৫।	শ্রী রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া	ঐ
৬।	শ্রী প্রিয়দা রঞ্জন বড়ুয়া	ঐ
৭।	শ্রী কৈলাশ চন্দ্র বড়ুয়া	ঐ
৮।	শ্রী শান্তিপদ বড়ুয়া	ঐ
৯।	শ্রী সুহৃদ বড়ুয়া	ঐ
১০।	শ্রী বিলাসচন্দ্র বড়ুয়া	ঐ
১১।	শ্রী দীপেন্দ্র লাল বড়ুয়া	ঐ
১২।	শ্রী তপন কান্তি বড়ুয়া	ঐ
১৩।	শ্রী পীযুষ কান্তি বড়ুয়া	ঐ
১৪।	শ্রী যতীন্দ্র লাল বড়ুয়া	হোয়ারাপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম
১৫।	শ্রী রামমোহন বড়ুয়া	পশ্চিম আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম
১৬।	শ্রী প্রাণহরি বড়ুয়া	পূর্ব আধারমানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম
১৭।	শ্রী প্রকৌশলী সাতকড়ি বড়ুয়া	বীনাজুরি, রাউজান, চট্টগ্রাম
১৮।	শ্রী ডা. বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া	কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম
১৯।	শ্রী ডা. সুকোমল বড়ুয়া	হোয়ারাপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম
২০।	শ্রী প্রকাশচন্দ্র বড়ুয়া	হোয়ারাপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম
২১।	শ্রী অমিয় কুমার বড়ুয়া	কর্তালা, পটিয়া, চট্টগ্রাম
২২।	শ্রী যোগেন্দ্র লাল সিকদার	উখিয়া, ভালুকিয়া, পালং, কক্সবাজার

সূত্র ঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৭ ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানকারী গ্রামের নামঃ

গ্রামগুলির নাম		
১।	আবুরখীল	রাউজান থানা
২।	হোয়ারাপাড়া	ঐ
৩।	পাহাড়তলী	ঐ
৪।	বীনাজুরি	ঐ
৫।	আধারমানিক	ঐ
৬।	জয়নগর	ঐ
৭।	ফতেনগর	ঐ
৮।	রাউজান	ঐ
৯।	হিঙ্গলা	ঐ
১০।	পাঁচখাইন	ঐ
১১।	বাগোয়ান	ঐ
১২।	পিঙ্গলা	পটিয়া থানা
১৩।	কর্তালা	ঐ
১৪।	বেলখাইন	ঐ
১৫।	বেতাগী	রাঙ্গুনিয়া থানা
১৬।	পদুয়া	ঐ
১৭।	আবদুলাহপুর	ফটিকছড়ি থানা
১৮।	কধুরখীল	বোয়ালখালী থানা
১৯।	শাকপুরা	ঐ
২০।	হাজারীরচর	ঐ

সূত্র ঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উৎস ঃ

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার সমূহঃ

Bangladesh District Gazetteers, Chittagong 1975, S.N.H. Rizvi (ed)

Bangladesh District Gozetteers, Patuakhali, 1982, Major General M.A. Latif (ed), B.G. Press, Dhaka.

Bangladesh District Gazetteers, chittagong Hill Tracts, 1975, Mohammad Ishaq (ed), Government of Bangladesh.

প্রকাশিত দলিলপত্রঃ

১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র,* ১৯৮২, চতুর্থ খন্ড, নবম খন্ড, ষষ্ঠ খন্ড, অষ্টম খন্ড, দ্বাদশ খন্ড, চতুর্দশ খন্ড, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অপ্রকাশিত সরকারী নথিপত্রসমূহঃ

Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Political, Bangladesh national Archieves, Bundle-61, April, 1952, proceedings No. 389-91;
Bundle-60, March, 1951, Proceedings. No.404-408;
Bundle-72, April, 1953, Proceedings No. 647-655;
Bundle-69, January 1953, Proceedings N0-1455 to 1466;
Bundle-83, Sep, 1953 Proceedings No...237;
Bundle-48, July, 1949, Proceedings No-292-9;
Bundle-138 May , 1957, Proceedings No.225;
Bundle,-48, July, 1949, Proceedings No-292-93.

সেন্সাস রিপোর্ট ও কমিশন রিপোর্ট সমূহঃ

Census of India, 1921, Report by W.H. Thompson, Vol-V, Bengal, Part-1. Calcutta, 1923.

Census of Pakistan Population, 1961, Tables & Report by H.H. Nomani, S.K. Vol-2, East Pakistan, Karachi, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

Life is not our's : Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991,

সাময়িকী (ইংরেজী)ঃ

Buddha Jayanti Souvenir, Colombo, 1956.

Epigraphia of Indica.

Indian Historical Quarterly.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series.

সাময়িকী (বাংলা)ঃ

কৃষ্টি, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ পত্রিকা, ঢাকা।

জগজ্জ্যোতি, কলকাতা।

অনোমা, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম।

উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

গিরিনির্ঝর, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা।

বোধন-প্রথম খন্ড, স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-সলিল বিহারী বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, ১৯৭২ ।

দৈনিক পত্রিকাঃ

দৈনিক আজাদী

The Hindustan Times.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈতীতিয়ক উৎস ঃ

গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা)ঃ

আলম, মাহবুব, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।

আহমেদ, নাজিমুদ্দিন, *মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর*, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা, ১৯৭৯।

আহমেদ, ড. শরীফ, *কালের দর্পণে স্বদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

ঘোষ, সতীশচন্দ্র, *চাকমা জাতিঃ জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৯০৯।

চাকমা, নীরুকুমার, *বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, কলকাতা, ১৯৭৮।

চাকমা, সুগত, *বাংলাদেশের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

চাকমা, বঙ্কিমচন্দ্র, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৮।

চাকমা, সিদ্ধার্থ, *প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৯২(বাংলা)।

চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, রাঙামাটি, ১৯৯১।

চৌধুরী, আবদুল হক, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।

চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, ১৯৯০।

চৌধুরী, সুকোমল, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮০(বাংলা)।

চক্রবর্তী, রতনলাল, *বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৫)*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৪।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, ২য় সংস্করণ, *বৌদ্ধ ধর্ম*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯২৩।

দেওয়ান, বিরাজ মোহন, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, রাঙ্গামাটি, ১৯৬৯।

দেওয়ান, অশোক কুমার, *চাকমা জাতির ইতিহাসবিচার*, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান, বঙ্কিম কৃষ্ণ, *চাকমা পূজা-পার্বণ*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৯।

দেওয়ান, কামিনী মোহন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের কাহিনী*, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, রাঙামাটি, ১৯৭০।

বড়ুয়া, নূতন চন্দ্র, *চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস*, কুসুমকুমার বড়ুয়া ও চম্পা বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৬।

বড়ুয়া, প্রণব কুমার, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

বড়ুয়া, জিতেন্দ্রলাল, *আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ২য় খন্ড, মনমোহন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৯(বাংলা)।

বন্দোপাধ্যায়, অনুকূল চন্দ্র, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম*, ফার্মা, কে, এল, এম প্রাঃ লিঃ ,+ কলকাতা, ১৯৬৬।

ভট্যাচার্য, বিনয়তোষ, *বৌদ্ধদের দেব-দেবী*, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২(বাংলা)।

ভিক্ষু, সুনিথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

দাসগুপ্ত, নলিনীনাথ, *বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম*, এ মুখার্জী, কলকাতা, ১৩৫৫(বাংলা)।

মহাস্থবির, ধর্মাধার, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, বড়ুয়া ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭৪।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলা, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩ খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৩।

মৃধা, শহীদুলাহ, *মহাস্থবির শীলভদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

রায়, নীহাররঞ্জন, ২য় সংস্করণ, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২(বাংলা)।

রায়, যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, কলকাতা, ১ম ও ২য় খন্ড, ১৩১৯-১৩২২(বাংলা)।

আহমেদ, ড. শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১ ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র, ২য় সংস্করণ, *বৃহৎ বঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম ও ২য় খন্ড, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থসমূহ (ইংরেজী)ঃ

Alam, A.K.M Shamsul, *Sculpture Art of Bangladesh*, Department of Archaeology, Dhaka, 1985.

Basham, A.L. *The Wonder that was India: a survey of the culture of the Indian subcontinent before coming of the Muslims,* Orient Longmans, Calcutta, 1963.

Barua, Dipak Kumar, *Viharas in Ancient India,* India, Publication, Calcutta, 1969.

Beal, Samuel, *Buddhist Records of the Western World*, Vol-1&2, Low Price Publication, Delhi, 1995 (Reprient).

Bessaignet, Pierre, *Tribesman of the Chittagong Hill Tracts,* Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1958.

Bhattasali, N.K. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in Dacca Museum,* Indological Book House, Varanasi, 1972.

Bapat, P.V. (ed), *2500 years of Buddhism,* Delhi, 1956.

Bhutta, Zulfikar Ali, *If I am Assassinated,* Bikash publishing, Delhi, 1969.

Chatterjee, S.P, *Bengal in Maps,* Calcutta, 1945.

Dutta, Sukumar, *Buddhist Monks and Monasteries of India*, George Allen & Unwin Ltd. London, 1962.

Dani, A.H. *Buddhist Scupture in East Pakistan,* Govt. of Pakistan, Department of Archaeology, Karachi, 1959.

Eliot, Sir Charles, *Hinduism and Buddhism:* An Historical Sketch Vol-i,ii,&iii, Routledge & Kegan Paul, London, *1968 (Reprint).*

Hutchinson, R.H.S, *Chittagong Hill Tracts.* Vivek Publishing Company, Delhi, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

Hunter, W.W. *A Statislical Account of Bengal*, Vol-V, London, 1875.

Hall, D.G.E. *A short History of South East Asia,* New York, 1968 3rd ed..

Khan, Abdul Mabud. *The Maghs A Buddhist Community in Banladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1999.

Majumdar, R.C (ed) *History of Bengal*, Vol-1, University of Dhaka, Dhaka, 1993.

Mohathera, Vishuddhananda, *Buddhism in Bangladesh,* Dhaka, 1983.

Risely, H.H. *Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary,* Vol-1, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891.

Watters, Thomas, *On Yuang Chwang's Travel in India,* 2 Vols. London Royal AsiaticSociety,London, 1904-5.

:::: O ::::